আঠারো শ' সাতান্নের

বিদ্রোহ

শ্রী অশোক মেটা

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

কলকাতা ● ১৩৫৩

কংগ্রেস সোশালিস্ট নেতা শ্রীঅশোক মেটা রচিত *1857 : The Great Rebellion* গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ। প্রচ্ছদপটের লাল রেখাভ্যন্তরের চিত্র আমেরিকার 'টাইম' কাগজের সৌজন্যে। বইয়ের অন্যান্য ছবি সংগৃহীত হয়েছে বিলাতের *Picture Post* কাগজ থেকে।

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দু' টাকা

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে জে, এন, সিংহ রায় কর্তৃক ২২নং ক্যানিং স্ট্রীট কলকাতা থেকে প্রকাশিত। মুদ্রাকর: শ্রীশশধর চক্রবর্তী, কালিকা প্রেস লিমিটেড, ২৫নং ডি, এল, রায় স্ট্রীট, কলকাতা।

জয়প্রকাশকে

সস্নেহে

সূচী

চিত্রসূচী

১৮৫৭

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ—তার সংগ্রাম ও সংঘর্ষ, তার বীরত্ব ও অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতার বিবরণ কোন ভারতীয়ের পক্ষেই লেখা সহজ নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ঐ রচনা একান্তভাবে হৃদয়ের ভাবাবেগাতিশয্যশূন্য হওয়া সম্ভব নয়। "১৮৫৭" ভারতীয়ের হৃদয়ে একটি বিদ্যুৎস্ফুরণের দীপ্তি সঞ্চার করে। আমাদের জনসাধারণ বিদ্রোহের বিভিন্ন ঘটনার কথা বলাবলি করেনা। সেটা খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু তাদের স্মৃতির গহনে সেগুলি রহস্যাবৃত হয়ে জীবন্ত রয়েছে। একদা জনৈক মিশনারী একদল ভারতীয় বালককে সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে বলেছিলেন। "প্রত্যেকেই একটি ক'রে সাদা কাগজ' দাখিল করেছিল। বিদ্রোহের কাহিনী লিখতে তাদের সর্বসম্মত এবং অকুণ্ঠ অনিচ্ছা এই সাদা কাগজের মারফত স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছিল" (ডব্লিউ, এইচ ফিসেট লিখিত 'দি টেইল অব দি গ্রেট মিউটিনি,' পৃ ৪৪০)। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও লেখকেরা বিদ্রোহ সম্পর্কে যে ঝুরি ঝুরি বই লিখেছেন, সে-গুলি দ্বারা আমরা প্রভাবান্বিত হইনি। বিদ্রোহের স্মৃতি আজও আমাদের মনে এক অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পক্ষান্তরে আজ পর্যন্ত কোন ব্রিটিশ ঐতিহাসিকই বিদ্রোহকে তার যথার্থ পটভূমিকায় বিচার করতে সক্ষম হননি। বিদ্রোহে ইংরেজের পক্ষ সমর্থনকারী ব্রিটিশ লেখকদের একটা সুবিধা আছে। তাদের যুক্তি সমর্থনের উপযোগী অনেক উপাদান তাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সহজ। ভারতীয়েরা বিদ্রোহে পরাজিত হয়েছে, তাদের পক্ষে দলিলপত্র ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান সে-পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই

বিদ্রোহে নিহত ভারতীয় শহীদদের স্মৃতিকে মসিলিপ্ত করতে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা কোন চেষ্টাই বাকী রাখেননি। তাদের সে-সব ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জিত বিবরণ থেকে সত্য ঘটনার উদ্ধার সাধন সহজ নয়। প্রায় এক শতাব্দী কাল পরে বিদ্রোহ-নায়কদের চরিত্রচিত্রণও কঠিনসাধ্য।

সিপাহীবিদ্রোহের বহু বিবরণ আছে—কিন্তু একটিও প্রকৃত ইতিহাস নেই, নেই সেযুগের অবসানকালীন পরিবেষ্টনীর পরিপূর্ণ ইতিবৃত্ত। সেই ঘটনা বহুল বছর গুলির মহাকাব্য রচনা করা একমাত্র ভারতীয় ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু খুব কম ভারতীয় লেখকই বিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। একমাত্র বিনায়ক সাভারকারকে এর ব্যতিক্রম বলা চলে। অপ্রকাশিত বহু দলিল পত্র ঘেঁটে তিনি একটি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ভাবালুতার আতিশয্য এবং যৌবনোচিত হৃদয়াবেগ ও দেশপ্রেমের প্রভাবের দ্বারা সে পুস্তক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকতার মর্যাদা লাভ করেনি। সেটা ইতিহাস অপেক্ষা আবেদন রূপেই অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সিপাহী বিদ্রোহের যথার্থ বিবরণ রচনার ভার ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের অপেক্ষায় আছে।

এই পুস্তকে বিদ্রোহের পরিপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস নেই। ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমপরিণতিতে এই বিদ্রোহের তাৎপর্য কী এবং প্রভাব কতখানি তা বিচার করাই এ রচনার উদ্দেশ্য। এ ধরণের পুস্তকে একটি সম্পূর্ণতার অভাব একপ্রকার অপরিহার্য বলা যেতে পারে। তবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বিদ্রোহের যে-সকল তথ্য নগ্ন সত্যের জ্বলন্ত অক্ষরে উৎকীর্ণ হওয়ার যোগ্য, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

এক

বিদ্রোহের কারণ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। বিভিন্ন বিরোধী ভাবধারার সংঘাতে ভারতবর্ষ আলোড়িত। ১৮৫৭ সালের মধ্যে সমগ্র দেশ আসন্ন ঝড়ের পূর্বক্ষণে বিদ্যুতগর্ভ মেঘের মতো থমথমে ভাব ধারণ করেছে। পূর্ববর্তী একশ বছরে ব্রিটিশ শাসন দক্ষিণে সমুদ্রতীর থেকে উত্তরে তুষারশীর্ষ হিমালয়ের প্রান্তদেশ অবধি বিস্তার লাভ করেছে এবং দেশের এই ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত জীবনের মধ্য দিয়েই জনগণের হৃদয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের মতো ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে।

কোন কোন জায়গায় রাজন্যবর্গেরা ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। যেমন, লাড্ডা (১৮৪৫) ও আঙ্গুলে (১৮৪৭)। কোথাও বা তাদের দেওয়ানেরা বিদেশী প্রভুদের বিরোধিতায় যুদ্ধ করেছে। যেমন—হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীনে। প্রায় সর্বত্রই ব্রিটিশের নিবৃত্তিহীন পররাজ্য গ্রাসের ক্ষুধায় জনগণ বিক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

ব্রিটিশেরা বহুরাজ্য দখল করেছে, সংখ্যাতীত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই রাজ্যগ্রাসের নীতি দ্বারা তারা নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণী, অযোধ্যার বেগম প্রভৃতি এমন বহু কর্ম-নিপুণ জননেতা ও সাধারণ ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারবঞ্চিত করলো যারা দীপ্তরোষ ভুজঙ্গের মতো প্রতিহিংসা গ্রহণের সুযোগের অপেক্ষায় মাত্র ছিল। দেশের মধ্যে যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বারুদ জমে উঠেছিল তাঁরা তাতে বিস্ফোরণের অগ্নি জোগালেন। “ভারতবর্ষকে জয় করা সহজ কিন্তু শাসন করা কঠিন।” (উইলিয়ম আর্চার কৃত ‘ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড দি ফিউচার’, ৪২ পৃঃ)।

গুপ্ত সংগ্রাম

বহুবর্ষ ধরেই অসন্তোষের ক্ষুদ্র-বৃহৎ তরঙ্গোৎক্ষেপ দেখা দিচ্ছিল। সাহারাণপুর জেলায় একটা গুরুতর রকম বিদ্রোহ ঘটেছিল। দিল্লী বাহিনীতেও একাধিক মাঝারি গোছের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। মীরাট এবং মোরদাবাদে সামান্য গণ্ডগোল হয়েছে। “ইংরেজের দিন ঘনিয়ে এসেছে, ইংরেজেরা নিপাত হোক” এই ধ্বনি মুখে মুখে ধ্বনিত হয়ে উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহের ভাব দানা বাঁধতে লাগলো (১৮২৪)। ১৮২৬-২৭ সালে উমাজী নায়েকের নেতৃত্বে রামোসি বিদ্রোহ পুণায় আগুন জ্বালিয়েছে। বিহারে কোল-বিদ্রোহ দমন করতে বহু সহস্র সৈন্যক্ষয় করতে হয়েছে, প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল বিধ্বস্ত করতে হয়েছে

(১৮৩১-৩৩)। ১৮৪৪'এ সাওয়ান্তবাদী বিদ্রোহ এমন সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করলো যে, তা দমন করতে সেনাপতি আউটরামকে দশ হাজার সৈন্য নিয়োগ করতে হয় এবং সে সত্ত্বেও সে বিদ্রোহের আগুন ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ধূমায়িত ছিল। ১৮৪৩ সালে কাঙ্গরা, জাসওয়ার এবং দাতারপুরের রাজারা নূরপুরের ওয়াজিরের সঙ্গে মিলে ও শিখ যাজকপ্রধান বেদী বিক্রম সিংহের সহায়তায় বিদ্রোহের ব্যাপকতা বাড়িয়ে তুললেন। বেদী বিক্রম সিংহ গুরু নানকের বংশধর। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটেছে। জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ রাজত্ব অবসানের সম্ভাবনা দেখা দিল।

ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গুপ্ত যুদ্ধ নানা ভাবে নানা দিক থেকে কয়েক বছর ধরেই চলতে সুরু করেছিল। স্যার জন ম্যালকম লিখেছেন, "যখনই যুদ্ধে পরাজয় বা সৈন্যদলে অসন্তোষের ফলে আমাদের দুঃসময় দেখা দেয়, তখনই দেশে প্রকাশ্য ভাবে নানারকম বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা প্রচারিত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞপ্তিগুলিতে ইংরেজকে নীচ জাতের পরাস্বপহারক রূপে চিত্রিত করা হয়।" চিঠিতে, কাগজে, পত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়, ভারতীয়দের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করা, তাদের পদানত রাখা, ও সকল রকমে তাদের দুর্গতির মধ্যে ফেলে রাখাই ইংরেজের উদ্দেশ্য। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে কলুষিত করাই তাদের কাজ। এই সকল বিজ্ঞপ্তি ও পত্রে ইংরেজের অধীনে ভারতীয় সিপাহীদের প্রতি আবেদন থাকে,—"ইংরেজেরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়,

তাদের সাবাড় কর।" কিন্তু ইংরেজ তখন পর্যন্ত ছিল পর্বতের মতো অটল এবং অপরাজেয়। তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা সমুদ্রতরঙ্গের মতো কেবলই ব্যর্থতা-জাত হতাশার বেলাভূমিতে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো।

অপরাজয়ের খ্যাতি বিচূর্ণ

ইংরেজকে যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়া যায় না বলে লোকের মনে একটা ধারণা জন্মেছিল। আফগান যুদ্ধে ইংরেজের দুরবস্থা ও তাদের বিরুদ্ধে শিখদের অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সে-ধারণা ধূলিসাৎ করলো। তাছাড়া অনেকের মনে এ বিশ্বাস দেখা দিয়েছিল যে, পলাশীযুদ্ধে জয়লাভের ঠিক একশো বছর পরে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সমাপ্তি ঘটবে। এই বিশ্বাস জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ শাসন ধ্বংশ করার আগ্রহকে দৃঢ়তর করলো, ঠিক যেমন জোয়ারের জলে ভাসানো নৌকার পালে অনুকূল বাতাস তার গতিবৃদ্ধি করে।

যেই মাত্র বোঝা গেল যে, স্বাধীনতার যুদ্ধে দেশীয় সিপাহীদের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে তখনই সে আগ্রহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হলো।

হেসে, খেলে একরকম আপনার অজ্ঞাতেই সিপাহীরা ইংরেজের জন্য এক সাম্রাজ্য জয় করেছে। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তি দেশে যতই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হতে লাগলো সিপাহীদের অবস্থাও

ক্রমশঃ ততই খারাপ হতে স্নুরু করলো! “যে সাফল্য সিপাহীরা তাদের প্রভুদের দান করলো, সেই হলো তাদের কাল” (টি, রাইস হোমস্ লিখিত ‘এ হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি’, পৃঃ ৬৯)। তাদের শক্তির জন্য ব্রিটিশেরা তাদের অত্যন্ত অবিশ্বাস করতে লাগলো, কী জানি কবে তারা বেঁকে বসে! প্রত্যেক সেনাদলেই এমন একজন দু’জন দেশীয় অফিসার ছিল যাদের পুরস্কারের ছুতো করে পুরো পেন্সনে দল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হতো। সিপাহীরা সাহেব অফিসারদেরই শুধু অনুগত থাকবে, তাদের কথায় উঠবে বসবে এই ছিল রীতি। যদি কোন দেশীয় অফিসার সিপাহীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হয়ে উঠতো অমনি তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হতো। (ভি, জেকোমণ্ট লিখিত ‘লেটার্স ফ্রম ইণ্ডিয়া’, পৃঃ ২৩)।

এই নীতির ফল দাঁড়ালো এই যে একজন সিপাহী সুবেদার হয়ে বড় জোর মাসিক ১৭৪ টাকা মাইনে আশা করতে পারতো। অথচ একজন ‘সাধারণ’ ব্রিটিশ সৈন্যের প্রাথমিক বেতনও ওর চাইতে বেশী ছিল। ওয়াজির খান নামে একজন সিপাহী একবার গভীর দুঃখের সঙ্গে স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলকে বলেছিল, “রসিলদার হয়ে আমি সৈন্য দলে ঢুকেছি, যতদিন চাকুরী করবো ঐ রসিলদার হয়েই আমাকে থাকতে হবে, কালা আদমীর কোন পদোন্নতির আশা নেই।” (ক্যাম্পবেলের ‘মেময়র অব মাই ইণ্ডিয়ান ক্যেরিয়র’, পৃঃ ৮৫)। সিপাহীদের আত্মসম্মানকে পদে পদে পদদলিত করা হতো। ফ্রেডরিক জন শোর

লিখেছেন—"অফিসারেরা প্রায়ই প্যারেডের সময় সিপাহীদের অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করতো।"

সিপাহীদের অসন্তোষ

সিপাহীদের শুধু যে পদোন্নতির আশা ছিলনা, তাই নয়, তাদের অবস্থাও ছিল শোচনীয় এবং ক্রমশঃই তা শোচনীয়তর হচ্ছিল। সিপাহীদের সহায়তায় ব্রিটিশ রাজত্বের সীমানা যতই বিস্তৃত হতে লাগলো ততই সিপাহীদের নিজ বাড়ী-ঘর ছেড়ে দূর হতে দূরান্তরে গিয়ে থাকতে হলো। অথচ তার জন্য তারা অতিরিক্ত কোনো ভাতা পেল না। পাঞ্জাব ও সিন্ধু ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হওয়ার ফলে সিপাহীদের দুর্দশা বেড়ে উঠল। 'বাট্টা' বন্ধ করায় সিপাহীদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিলো এবং তারই ফলে একটা স্বতঃস্ফূর্ত একতার উদ্ভব হলো তাদের মধ্যে। (জি, ডব্লিউ ফরেষ্ট লিখিত 'এ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০)।

প্রধানতঃ ভারতবর্ষে যুদ্ধ করার জন্যই এদের চাকুরীতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই তাদের বিদেশী যুদ্ধে পাঠানো হতে লাগল। ১৮২৪ সালে ব্যারাকপুরের একদল সিপাহী ব্রহ্মদেশে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করল। তাদের প্রাণদণ্ড হলো এবং গভর্ণর জেনারেল 'জেনারেল এষ্টাব্লিশমেণ্ট অ্যাক্ট' পাশ করলেন। এই আইনে ভারতবর্ষে যে-সকল সিপাহীকে

কাজে নেওয়া হবে তাদের যে-কোনো জায়গায় যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা যাবে। অর্থাৎ কলমের এক আঁচড়ে ভারতীয় বাহিনীকে সাম্রাজ্যিক বাহিনীতে পরিণত করা হলো। সিপাহীদের অসন্তোষ এর ফলে আরও বাড়লো। তা ছাড়া বেঙ্গল আর্মির সিপাহীরা অনেকদিন থেকে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করে আসছিল। তাদের চিঠিপত্র লিখতে পয়সা খরচ হতো না, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়ার কালে তাদের টোল অর্থাৎ শুল্ক দিতে হতোনা। এই সুবিধাগুলি হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। সিপাহীদের খ্রীষ্টান করার চেষ্টা তাদের আরও রুষ্ট করলো। জনৈক হিন্দু লিখিত "কসেস অব রিভোল্ট" বইতে আছে যে "ব্রিটিশ অফিসারেরা সিপাহীদের লোভ দেখাতে লাগল যে, কোন সিপাহী ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হলেই তাকে হাবিলদার করে দেওয়া হবে, হাবিলদারকে করা হবে সুবেদার মেজর।" এই সব কারণ ও চর্বি দেওয়া কার্তুজের ব্যবহার সিপাহীদের মধ্যে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। স্যার জন লরেন্সকে একজন সিপাহী একদিন স্পষ্টই বললো, "ইংরেজ যদি সিপাহীদের এই অভিযোগের কারণগুলি দূর না করে তারা নিজেরাই তা দূর করার ভার নেবে।"

এই ধূমায়িত অসন্তোষ এক ব্যাপক ও গভীর মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হলো অন্য আর একটি কারণে। অকস্মাৎ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে অযোধ্যাকে ইংরেজ শাসনভুক্ত করা হলো। অযোধ্যাকে সিপাহীদের পিতৃভূমি বলা চলে। এখান থেকেই আসত

বেঙ্গল আর্মির বারো আনা সিপাহী। সুতরাং সিপাহীদের জাতীয়তায় দারুণ আঘাত লাগলো এই বিশ্বাসঘাতকতায়। সিপাহীরা এখন শুধু তুচ্ছ ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি নিয়ে নয়, অন্তরের অতৃপ্ত বাসনায় অস্থির হয়ে উঠলো। পেতে চাইলো স্বাধীনতার স্বাদ। অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যার নবাবের ষাট হাজার সৈন্য ছাড়িয়ে দেওয়া হলো। এতে প্রত্যেক সিপাহীরই আর্থিক ক্ষতি ঘটলো। কারো ভাই, কারো ভাইপো, কারো বা অন্য কোনো আত্মীয় বেকার হয়ে পড়লো। মোগল সম্রাট, নানা সাহেব ও অযোধ্যার বেগমের প্রতি জনসাধারণের মনে দীর্ঘ কালের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল। তাঁদের কেন্দ্র করেই সিপাহীদের স্বাধীনতার স্পৃহা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আসন্ন বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন।

অসন্তোষের প্রচুর বিষ ছড়িয়ে ছিল চারিদিকে, সমস্ত একত্র হয়ে সংহার মূর্তি ধারণ করলো ধীরে ধীরে।

শাসনের অব্যবস্থা

শাসন ব্যবস্থা যেমন ছিল অক্ষম তেমনি ছিল অপ্রতুল। যখনই কোন নতুন রাজ্য দখলে আসতো তখনই সকল রকম অশান্তি মিলে ভূমি সমস্যা দেখা দিত। অনেক জেলা বরাবরই ব্রিটিশ শাসনকে অগ্রাহ্য করে চলতো। এই বিচ্ছিন্ন ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের আগুন কেন্দ্রীভূত করার অপেক্ষায় মাত্র ছিল।

শাসন ব্যাপারে অব্যবস্থার একটা আভাস পাওয়া যায় হল্ট ম্যাকেঞ্জীর একটি রিপোর্টে। তিনি লিখেছেন,—"দেশের লোকেরা যে ভূমি-ব্যবস্থায় অভ্যস্ত আমরা তা বাতিল করে দিয়ে রাজস্ব আদায়ের নতুন আইন-কানুন চলতি করতে চেষ্টা করলাম। একবার ভেবে দেখলাম না সে আইন-কানুনগুলি ন্যায়সঙ্গত কিনা, এদেশের লোকের পক্ষে উপযোগী কিনা। তাদের উপরে এই নতুন ভূমি-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে তারা এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়লো!"

দেশীয় কর্মচারী ও জনসাধারণ সবাই প্রাচীন প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনে অত্যন্ত দুঃখিত হলো। তারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবলো, হায় রে, তেহি ন দিবসা গতা। কোথায় গেল সেই প্রশান্ত, গম্ভীর, কায়দাকানুন রপ্ত মর্যাদাশীল কর্মচারীরা, কোথায় বা গেল তাদের জমকালো জোব্বা, জরির কাজ করা জুতা, বহুবর্ণের উষ্ণীশ, আর অতিকায় আলবোলা। তাদের প্রাণখোলা অট্টহাস্য এবং অঙ্গুলী সঞ্চালন দ্বারা লম্বিত শ্মশ্রু পরিচর্যা আর দেখা যায় না। দেখা যায় না সরকারী চিঠি পত্রে সাহিত্যরসের সামান্যতম নিদর্শন বা সেই সবিনয় লিখন চাতুর্য। তার স্থান দখল করেছে বিদেশী একদল লোক যারা জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন, পীড়নকারী ও রসকসহীন কাঠখোট্টা কর্মচারীর উপরে আর কিছুই নয়। তাঁদের মধ্যে

সবচেয়ে যারা ভালো লোক, যেমন বার্ড কিম্বা টমসন, তাঁরা পর্যন্ত সুযোগ পেলেই দেশীয় জনসাধারণকে অপমান করতে কসুর করতেন না। জনসাধারণের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, তাঁদের করুণা অবমাননাকর, তাঁদের দান অবজ্ঞার।

বিচার, পুলিশ ও রাজস্ব বিভাগে যে-সকল ভারতীয় কাজ করতেন, বিশেষ করে যাঁরা উচ্চবংশোদ্ভূত, তাঁরাও বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং বিদ্রোহের আয়োজন যাতে ধরা পড়ে না যায় সে-জন্য তাঁরা তাকে গোপনীয়তার আবরণে ঢেকে রেখেছেন।

আর্থিক অভিযোগ

আর্থিক অভিযোগসমূহ এই অসন্তোষের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করল। জমিজমা সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তার ভাব জনসাধারণকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশ কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তরের দলিল পত্র মানতে চাইত না, এমন কি আদালতের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতো। মৈজপুরের রাজাকে তাঁর জমিদারীর ১৫৮ খানা গ্রামের মধ্যে ১১৬ খানা থেকে বঞ্চিত করা হলো। আরও এমন দৃষ্টান্ত আছে। তৎকালীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, বর্তমানে যা যুক্তপ্রদেশ নামে পরিচিত, আর একজন রাজার ২১৬ খানা গ্রামের মধ্যে ১৩৮ খানা কেড়ে নেওয়া হলো এবং আরও নেওয়ার জন্য তশিলদারকে

হুকুম করা হলো সে যেন রাজার পক্ষে প্রদত্ত ডিক্রি-জারীটা বাকী রাখে।

অনেক জমিদারকে দত্তকগ্রহণে বাধা দিয়ে তার সম্পত্তি বেওয়ারীশ ঘোষণা করা হলো। সম্পত্তির মালিকানা বহু ভাগীদারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়াতেও অনেক বিত্তবান পরিবারের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে পড়ল। এই দরিদ্রকরণ পদ্ধতি আরও ত্বরান্বিত হলো অনেক নতুন নতুন ট্যাক্সের ফলে। পানিপথ জেলায় পুলিশের কাজে ছিল ২২ জন ঘোড়সওয়ার অথচ ট্যাক্স আদায়ের জন্য ১৩৬।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে রাজস্বকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। গভর্ণমেণ্ট পাবে শতকরা ৬৬⅔ ভাগ, তালুকদারেরা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাবে ১৮ ভাগ, আর জমির স্বীকৃত মালিক পাবে মাত্র ১৫⅓ ভাগ। জমি ধীরে ধীরে কুশীদজীবিদের হাতে গিয়ে পড়তে লাগলো। এদের উপরে জনসাধারণের বিদ্বেষ এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সুদখোর, আড়তদার শ্রেণীর লোকদের জমিজমা উৎখাত করা হলো, অনেককে হত্যাও করা হলো।

অযোধ্যার তালুকদারদেরই ক্ষতি হয়েছিল সব চেয়ে বেশী। অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময়ে তালুকদারদের ২৩,৫৪৩ খানা গ্রামের মধ্যে ১৩,৬৪০ খানাই তালুকদার ছাড়া অন্য লোককে বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। এই গ্রামগুলির রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৫,০৬,৫১৯ টাকা। স্যার হেনরী লরেন্স লর্ড

ক্যানিংকে লিখেছিলেন যে তালুকদারেরা তাদের অর্ধেক জমিজমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কেউ কেউ বা সর্বস্ব হারিয়েছে। কৃষকদেরও কোনো লাভ হয় নি। উচ্চতর হারে খাজনা নির্ধারণ ও ট্যাক্সের চাপে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। যখন বিদ্রোহ ঘটলো লরেন্স নাকি বলেছিলেন—"জন্ লরেন্স, টম্পসন ও এডমনষ্টোনেরাই এই বিদ্রোহ ডেকে এনেছে।"

মুদ্রানীতি

জমির সত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও আদালতে বিচারহীনতার ফলে কৃষকদের পক্ষে শতকরা ৩০ কিম্বা ৪০ টাকা সুদেও ঋণ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। গভর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতি এই আর্থিক অব্যবস্থাকে আরও জটিল করে তুললো। অধ্যাপক টমাস দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষে ১৮২৫ সাল থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত খুব মন্দা গিয়েছে, জিনিষপত্রের দাম তখন খুব কমে গিয়েছিল। এর কারণ হলো মুদ্রার অভাব এবং স্বাভাবিক মুদ্রাব্যবস্থা থেকে বিনিময় মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন। (ইকনমিক হিষ্ট্রী রিভিউ, ১৯৩৬)। পৃথিবীতে যে পরিমাণ রূপার প্রয়োজন সে পরিমাণ রূপা পাওয়া যাচ্ছিল না (১৮৫০)। কাজেই ১৮৩৫ সালে আইনের ফলে ভারতবর্ষে যখন একান্তভাবে রৌপ্যমুদ্রানীতি প্রবর্তিত হলো, তখন লোকের অসুবিধার আর অন্ত রইল না। আশ্চর্য নয় যে লোকে বলতে লাগলো, "কোম্পানীর আমলে রুজি রোজগার নেই।"

ব্রিটিশ শাসনের আর্থিক প্রতিক্রিয়া হলো ভারতীয়দের জীবনে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী, তার নির্দয় পেষণ অনেক ক্লেশের কারণ হলো। আদিবাসীদের দৃষ্টান্তটা এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ প্রভুত্ব ধীরে ধীরে পাহাড় পর্বতে আদিবাসীদের উপরও আরোপিত হলো। আদিবাসীরা স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের নিজেদের পুরাতন বিধিব্যবস্থা নিয়ে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নে আপন মনে বাস করছিল। এই প্রথম তারা আক্রান্ত ও পদানত হলো। তাদের উপরে খেয়াল খুসী মাফিক নতুন আইন, নতুন খাজনা, নতুন বিচারপদ্ধতি, আইন-আদালত চাপিয়ে দেওয়া হলো। আদিবাসীরা তাদের নিজেদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার জন্য বীরত্বের সঙ্গে যুঝেছিল। ১৭৮৯ সালে তামারের আদিবাসীরা বিদ্রোহ করল এবং তাদের যুদ্ধও চলেছিল অনেকদিন পর্যন্ত। ১৭৯৪ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত কিছু দিন পরে পরেই হাঙ্গামা বেধেছে। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ ব্লাণ্টের রিপোর্টে দেখা যায় যে, শেষ দু'বার যে-হাঙ্গামা ঘটে তার কারণ মুণ্ডা ও ওড়াওদের কতগুলি অধিকার বে-আইনী ভাবে কেড়ে নেওয়া। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ তাদের পদানত করলো। (শরৎচন্দ্র রায় প্রণীত—দি মুণ্ডাস)।

অন্যান্য আদিবাসীদের মতো সাঁওতালদের অদৃষ্টেও একই লিখন। গোড়াতে তাদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল। সাঁওতাল পরগণার পাশ দিয়ে তিনশ মাইল রেললাইন খোলা হয়। তাতে সাঁওতালদের ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়ো সবাই

কাজ পেল, মজুর খেটে হাতে কাঁচা পয়সা পেল। ১৮৫৫ সালে ফসলও খুব ভালো হয়েছিল। কাজেই সবারই ঘরে খাবার স্বচ্ছলতা ছিল। ব্রিটিশ শাসনে একদল অত্যাচারী লোক সাঁওতালদের উপর জুলুম চালাচ্ছিল,—যেমন জমিদার, মহাজন প্রভৃতি। এবার সাঁওতালেরা তার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্যোগ করল। তীর ধনুক নিয়ে শত শত সাঁওতাল কলকাতার দিকে রওনা হলো। তাদের প্রথম লক্ষ্য হলো নারাণপুরের জমিদার। সে তাদের অনেক জ্বালিয়েছে, এবার তার প্রতিশোধ। তারা বন্য প্রকৃতির, সভ্য রীতি-নীতির ধার ধারেনা তারা। প্রথমে জমিদারের পা ছুটি কেটে ফেললো তারা, বলল, "এই চার আনা শোধ।" তার পর "আট আনা শোধ" বলে কাটলো হাটু, এমনি করে 'বারো আনা' ও 'একটাকা' শোধ করলো হাত ও গলা কেটে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া ঘটলো দ্রুত। ইংরেজ সেনাপতি এল সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাদের দমন করতে, বাঁধল সংঘর্ষ, এবং দশ হাজারের উপরে সাঁওতাল নিহত হলো।

সামাজিক ব্যবস্থা

দ্রুত আর্থিক পরিবর্তন জাতীয় জীবনের ভিৎকে যেমন প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল, ব্রিটিশ শাসনের, বিশেষ করে লর্ড ডালহৌসির আমলে, সামাজিক ব্যবস্থাটাও কম উদ্বেগের কারণ হয়নি। আট বছরের মধ্যে সাত সাতটা রাজ্য তিনি কেড়ে

নিয়েছিলেন। তার ফলে রাজনৈতিক ও শাসনকার্যে ভারতীয়-দের বুদ্ধি ও কার্যদক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এল। বিজিত রাজ্য ও দখল-করা জমি জমার বিলি ব্যবস্থায় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হলো। শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে একটা অলিখিত যোগাযোগ থাকে, ডালহৌসীর শাসন কালে সম্পূর্ণরূপে তার বিলুপ্তি ঘটলো। ১৭৮১ ও ১৭৯৭ সালের ২১ ও ৩৭ আইনে সুস্পষ্ট ভাবে একথা উল্লেখ ছিল যে "দেশীয় জনসাধারণের ধর্মমত ও আচার ব্যবহার অনুসরণ করেই আইন প্রণয়ন করা হবে।" কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল সে নির্দেশ মোটেই রক্ষিত হচ্ছেনা। অনেক ভারতীয়ই মনে করলো যে ডালহৌসী প্রণীত আইন শুধু যে নীতির দিক দিয়ে ঐ নির্দেশের বিরোধী তা নয়, অক্ষরে অক্ষরে তার পরিপন্থী। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে অত্যন্ত অজ্ঞ ও বহির্বিমুখ হিন্দুও পশ্চিমের ভাবধারার সংঘাত প্রথম উপলব্ধি করেছিল, (ডব্লিউ,লি, ওয়ার্শর কৃত 'লাইফ অফ মার্কুইস অফ ডালহৌসী')।

হিন্দুরা বিচলিত হলো, কেবল সামাজিক আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাজশক্তির ব্যবহারে নয়, পশ্চিমের ভাবধারার আসন্ন বন্যার আশঙ্কায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টার্স-এর সভাপতি মিঃ ম্যাকলস্ বিলাতের পার্লামেণ্ট সভায় স্পষ্টই বললেন, "অদৃষ্টের প্রসাদে হিন্দুস্থানের রাজত্ব যখন আমাদের হাতে এসেছে তখন তার একপ্রান্ত থেকে অপর

প্রান্ত পর্যন্ত ভগবান খ্রীষ্টের পতাকা উড্ডীন করা চাই। প্রত্যেক ভারতবাসীকে যাতে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা যায় সে-চেষ্টায় যেন কোনো রকম শৈথিল্য না ঘটে সে-দিকে সবারই নজর রাখা প্রয়োজন।"

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দারুণ অনাবৃষ্টি ঘটেছিল। ঐ বছর উত্তর ভারতে গভর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টান মিশনারীদের আশ্রয়ে অনেক অজানা শিশুদের লালন পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে সাধারণ লোকের মনে সন্দেহের উদয় হলো। তারা ভাবল, হিন্দুদের খ্রীষ্টান বানাবার এই একটা ফন্দী (সৈয়দ আহাম্মদ খান)। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিশনারীরা একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। তাতে লেখা ছিল যে, দেশে রেলগাড়ী ও জাহাজ ইত্যাদির প্রচলন ফলে বাইরে যেমন বিভিন্ন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়েছে, তেমনি এক ধর্মের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মিক মিলনও দূরবর্তী নয়।

রাজদ্রোহমূলক প্রচারকার্য

হিন্দুরা সাধারণতঃ একটু নিষ্ক্রিয় ধরণের। তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া যা ঘটলো তার অনেক বেশী ঘটলো মুসলমানদের মনে। তারা স্বভাবতঃই একটু দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। তারা গভীরভাবে বিচলিত হলো। সৈয়দ আমেদের আন্দোলন তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়নি। তাঁর শিষ্য ইনায়েৎ আলী ও ওয়ালিৎ

আলী তাঁর প্রারব্ধ কর্মকে চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৮৪৭ সালে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হলো এবং হুকুম হলো, তারা পাঞ্জাবে থাকতে পারবে না। পাটনায় থাকতে হবে তাদের এবং ভালোভাবে থাকবার প্রতিশ্রুতি হিসাবে জামিন দিতে হবে। ১৮৫০ সালে বাংলাদেশের রাজসাহীতে রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে ঐ জেলা থেকে দু'বার তাদের বহিষ্কৃত করা হয়। পরের বছরে দেখা গেল তারা আবার পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহের বিষ ছড়াচ্ছে। ১৮৫২ সালে পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দিলেন, সহরে বিদ্রোহী প্রকৃতির লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অথচ পাটনা ব্রিটিশ শাসনাধীন একটা প্রদেশের প্রধান সহর।

পুলিশের সঙ্গে তাদের গোপনে গোপনে যোগ ছিল। বিদ্রোহীদের একজন নেতা মৌলভী আহম্মদউল্লা তার বাড়ীতে ৭০০ অনুচর জড়ো করে রেখেছে এবং স্পষ্টই ঘোষণা করেছে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এ সম্পর্কে আর কোনো তদন্তের চেষ্টা করলে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাধা দেবে। (ডব্লিউ, ডব্লিউ হাণ্টারের 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্', পৃঃ ২২-২৩)। আর একজন সুদক্ষ সংগঠনকর্তা ও প্রধান প্রচারকারী ছিলেন ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদ শা'। তার বক্তৃতায় পূর্ণিমার চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের জলোচ্ছাসের মতো মুসলমানের উৎসাহ ও উদ্দীপনা উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। দেশের সর্বত্র মুসলমানেরা নতুন শক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে রইল, যেন বাদল দিনের জলভরা

২

এক খণ্ড মেঘ, যে কোনো মুহূর্তে অজস্র বৃষ্টি ধারায় ফেটে পড়তে পারে।

গভীর অসম্মান

ধর্মমত ছাড়াও এমন আরও অনেক ব্যাপার ছিল যাতে জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। আদালতগুলির আদর্শ হলো সবাইকে সমান গণ্য করা। ইংরেজ গর্ব করে বললো, তারা এদেশে ব্যক্তি সাম্যের প্রবর্তন করেছে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল আদালতে ইংরেজ ও ভারতীয় আসামীর বেলায় বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া নানারকম বিসদৃশ অব্যবস্থাও কম নয়। ১৮৩৪ সালে বেত্রদণ্ড তুলে দেওয়া হলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আইন হলো যে সেসন জজ বেত্রদণ্ডের বদলে দু'বছর জেল দিতে পারবে। একই অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট দিতে পারবে এক বছর এবং একজন এ্যাসিস্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পারবে ছ'মাস।

ইংরেজের সংস্পর্শে ভারতবর্ষে উঠলো আধুনিকতার ঝড়। সে ঝড় শুধু যে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, ধর্মমত, আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতিকেই নাড়া দিল তা নয়, নতুন ও পুরাতনের সংঘাতে এমন এক অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হলো যাতে বহুলোক হলো বিব্রত, সর্বস্বান্ত ও হতমান। বিদ্রোহীদের একটি ঘোষণাপত্রে লেখা ছিল—"মানুষের জীবনে সবার উপরে চারটি বস্তু

সবচেয়ে মূল্যবান। তার ধর্ম, তার জাত, তার আত্মসম্মান এবং তার নিজের ও প্রিয়জনের প্রাণ, তাদের ধন-সম্পত্তি। ব্রিটিশের রাজত্বে এর একটিও নিরাপদ নয়।"

এদিকে জনসাধারণের হাতে ছিল হাতিয়ার। দেশের এক তৃতীয়াংশ লোকের ঘরেই যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্র ছিল বলে মনে হয়। ১৮৫৭ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফ লিখলেন, "গত ছ'মাসের মধ্যে মুসলমান ও অন্যান্য দেশীয় জনসাধারণ হাজারে হাজারে তলোয়ার ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র কিনেছে।" (এ, ডাফ, লিখিত "দি ইণ্ডিয়ান রিবেলিয়ান", পৃঃ ৭৩)। যাদের দেহে ছিল শক্তি ও মনে সাহস, তারা তাদের জীবনের চরম আকাঙ্খার চারটি বস্তু—ধর্ম, জাত, সম্মান ও জীবনকে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠাদানের জন্য অস্ত্রধারণে কৃতসংকল্প হলো।

দুই

পরিবেশ

১৮৫৭ সালে কতগুলি বিশেষ ঘটনা বিদ্রোহের অনুকূল একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। ঠিক একশ বছর আগে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ এদেশে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। লোকের মনে একটা ধারণা জন্মেছিল, পলাশী যুদ্ধের একশ বছর পরেই ইংরেজ রাজত্বের শেষ। নানা রকম সাঙ্কেতিক চিহ্ন লোকের হাতে হাতে ফিরে জনসাধারণের মধ্যে আসন্ন বিদ্রোহের ভাব সঞ্চার করতে লাগল। তার মধ্যে একটি ছিল লাল পদ্ম। "সব লাল হো যায়েগা"—জনসাধারণ প্রকাশ্যে বলাবলি করতে লাগলো। পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহ এই কথাটা ব্রিটিশের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তি ও রাজ্যজয় লক্ষ্য করে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক স্বরেই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত লোকেরা তাকে এখন আসন্ন সংগ্রামের ধ্বনি রূপে ব্যবহার করতে সুরু করলো। "সব লাল হো যায়েগা।" বাঁধবে লড়াই, মরবে শত্রু, খণ্ডিত শির বিদেশীর রুধিরে ধরণী হবে রক্তরঞ্জিত।

সিপাহীরা অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিল। বিশেষ "বেঙ্গল আর্মির" লোকেরা প্রায় বছর কয়েক ধরেই অনেকটা আধা-বিদ্রোহের ভাব নিয়েছিল। তারা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার

অনুবর্তী হয়ে রুখে দাঁড়ালে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে সবারই মনে এই আশা ছিল, কারণ সে-সময়ে সামরিক দিক থেকে ইংরেজের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সৈন্য ছিল মাত্র ৪০হাজার, আর ভারতীয় সেপাহী ছিল ২ লক্ষ ১৫ হাজার। বিভিন্ন স্থায়ী সেনাদলের অবস্থিতি ছিল এই রকম :

		বাঙলা	মাদ্রাজ	বোম্বাই	মোট
ব্রিটিশ ক্যাভেলরী (ঘোড় সওয়ার দল)—রেজিমেণ্ট		২	১	১	৪
ব্রিটিশ ইনফ্যাণ্টরী (পদাতিক বাহিনী)—ব্যাটিলিয়ন		১৫	৩	৪	২২
কোম্পানীর ইউরোপীয় ইনফ্যাণ্টরী—ব্যাটিলিয়ন		৩	৩	৩	৯
আর্টিলারী ইনফ্যাণ্টরী	রেজিমেণ্ট	১২	৭	৫	২৪
ভারতীয় ইনফ্যাণ্টরী	রেজিমেণ্ট	৭৪	৫২	২৯	১৫৫
ভারতীয় ক্যাভেলরী	রেজিমেণ্ট	১০	৮	৩	২১

ভারতীয় ব্যাটিলিয়নের সৈন্য সংখ্যা বাংলায় ছিল ১,১০০ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে ৯০০। ব্রিটিশ ব্যাটিলিয়নের সব গুলিতেই ছিল ১০০০ করে।

বেঙ্গল আর্মি ছিল ভারতে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান অংশ। তার গঠন ছিল এই প্রকার :

স্থায়ী ভারতীয় বাহিনী

ইনফ্যাণ্টরী (পদাতিক)	৭৪ ব্যাটিলিয়ন
লাইট ক্যাভেলরী (ঘোড় সওয়ার)	১১ রেজিমেণ্ট
হর্স আর্টিলারী (ঘোড় সওয়ার'গোলন্দাজ)	৪ রেজিমেণ্ট
ফুট আর্টিলারী (পদাতিক গোলন্দাজ)	২ ব্যাটিলিয়ন

অস্থায়ী ভারতীয় বাহিনী

ক্যাভেলরী	২৩ রেজিমেণ্ট
শিখ ইনফ্যাণ্টরী	৭ ব্যাটিলিয়ন

ইউরোপীয় বাহিনী

ইনফ্যাণ্টরী	১৬ রেজিমেণ্ট
ক্যাভেলরী	২ ব্যাটিলিয়ন
হর্স আর্টিলারী	২ রেজিমেণ্ট
ফুট আর্টিলারী	৬ ব্যাটিলিয়ন

গোলন্দাজ দলে ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল ১২ হাজারের উপরে, ইউরোপীয় সংখ্যা ৬,৫০০।

এই সেনাদলেরা দেশের প্রায় একশ জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। ৪০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্যের বেশীর ভাগ ছিল ব্রিটিশ অধিকারের দুই প্রান্তদেশে, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন ঘাঁটিগুলি আগলে ছিল প্রায় ২০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য। ইউরোপীয় বাহিনীর গোলন্দাজদলও ছিল ঐ প্রদেশেই। ভারতের অন্যান্য স্থানে, বিশেষ করে বাংলা দেশে ইউরোপীয়

সৈন্যেরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। অযোধ্যায় ছিল মাত্র এক রেজিমেণ্ট। অনেক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ও ধনাগার প্রভৃতি দেশীয় সৈন্যদের রক্ষণাবেক্ষণেই ছিল।

দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে উচ্চবর্ণের লোকেরা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বিদ্রোহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল এবং সেনাবিভাগে তাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। বেঙ্গল আর্মির দেশীয় পদাতিক অংশে ব্রাহ্মণ ছিল ২৪,৮৪৯, রাজপুত ছিল ২৭,৯৯৩, নীচ জাতির লোক ১৩,৯২০, মুসলমান ১২,৪১৬, এবং খ্রীষ্টান ১,০৭৬।

সিপাহীরা এই অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, নিজেদের শক্তি সম্পর্কেও তাদের মনে কোন সংশয় ছিল না। বিভিন্ন গুপ্ত প্রচারপত্রে সিপাহীদের এক হওয়ার জন্য আবেদন প্রচারিত হলো—"ভাই সব, সিপাহীরা সব ঐক্যবদ্ধ হলে, ইংরেজ সৈন্যেরা তো সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের মতো। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ সিপাহীদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই, সমস্তটাই ফাঁকা মাঠ।" সিপাহীরা স্বাধীনতার জন্য যদি একবার লড়তে মনস্থির করে, তবে অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন হতে কতক্ষণ? কতক্ষণ টিকবে বিদেশী দুষমন? স্বাধীনতার শতদল আপনি বিকশিত হবে তার অফুরন্ত মধুভাণ্ডার নিয়ে। সিপাহীদের রক্তে নাচন লাগলো, চোখে জাগলো স্বপ্ন, বুকে সাহস। ইমার্সনের ভাষায় ভারতবর্ষের লুপ্ত চেতনা কামান-গর্জনে জেগে উঠলো।
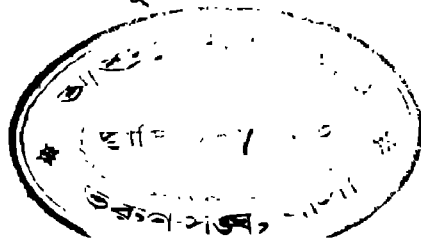
মুক্তি দিবস

পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিন ২২শে জুন। হিন্দুস্থানে তখন দারুণ গ্রীষ্মকাল, লেহি লেহি বিরাট অম্বর। ইউরোপীয় সৈন্যেরা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে এই গ্রীষ্মের প্রকোপে। আগুন-বাতাস তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাত হানে তাদের দেহে। সরকারী ধনভাণ্ডারেও রবিশস্যের আমদানী আসে এই সময়ে। বিদ্রোহীদের পক্ষে লুট করার যথেষ্ট সুযোগ হয় তাতে। বিদ্রোহীরা যখন দিল্লীতে সম্রাট বাহাদুর শাহের কাছে উপস্থিত হলো, সম্রাট বললেন, "আমার রাজকোষে অর্থ নেই, তোমাদের মাইনে দেব কেমন করে ?" বিদ্রোহীরা উত্তর করলো, "আমরা দেশের সর্বত্র বৃটিশ ধনাগারগুলি লুণ্ঠন করে এনে দেবো আপনার হাতে।"

বিদ্রোহের পরিকল্পনাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একই দিনে দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ সুরু করা হবে। ইউরোপীয় অফিসারদের হত্যা, জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া, সরকারী তোপখানা দখল, টেলীগ্রাফের তার কাটা, রেল লাইন ধ্বংস, বারুদখানা, সৈন্যঘাঁটি ও দুর্গ দখল--এই ছিল বিদ্রোহের কার্যক্রম। একদিনে একই সঙ্গে সর্বত্র এই আঘাতের দ্বারা বিদেশী শাসনের বনিয়াদ বিধ্বস্ত করা সম্ভব হবে। তারপর দেশের সর্বসাধারণকে সর্বপ্রকারে এই বিদ্রোহ সমর্থনের জন্য আহ্বান করা হবে। জনসাধারণকে লক্ষ্য করে যে-সকল

৭৫৭ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের একশ বছর পূর্বে, পলাশীর প্রান্তরে ভারতের আজাদী-সূর্য অস্তমিত। চিত্রে ব্রিটিশ সেনাপতি
াইভ ও ভারতীয় কুইসলিং মিরজাফরের মিলন-দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ১৭৫৭'র প্রতিশোধ সিপাহীরা নিতে চেয়েছিল ১৮৫৭ সালে।

আবেদন রচিত হয়েছিল সেগুলি থেকে বোঝা যায়, বিদ্রোহের উদ্যোক্তারা বিদ্রোহকে যথাসম্ভব ব্যাপক ও জনসাধারণের সহযোগিতা দ্বারা সফল করার আশা করেছিলেন। আবেদন পত্রগুলির রচনায় রাজনীতিজ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিচয় আছে।

১৮৫৭ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর জনৈক মোগল রাজকুমার কর্তৃক প্রচারিত একটি আবেদনের নমুনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

"সবাই জানেন যে হিন্দুস্থানের হিন্দু সমাজ এবং মুসলমান জনগণ কপটচারী ও বিশ্বাসহন্তা ব্রিটিশের শাসনাধীনে অত্যাচারিত ও বিধ্বস্ত। নিজ ধর্ম রক্ষার জন্য বহুদিন আগে যে সকল হিন্দু ও মুসলমান প্রধানেরা নিজেদের গৃহ পরিত্যাগ করেছেন এবং দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ণের চেষ্টায় নিরত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে এই ধর্মযুদ্ধ পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং জনসাধারণের অবগতির জন্য এই ইস্তাহার প্রচার করা গেল। তারা যেন নির্দেশগুলি বর্ণে বর্ণে পালন করেন। যারা এই ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছুক অথচ যাদের নিজেদের কোন সংস্থান নেই তারা আমার কাছ থেকে জীবন ধারণের উপযোগী খরচ পাবে। পঞ্জিকাকার, গণৎকার, মুসলমান ফকির ও যারা ভবিষ্যৎ জানতে পারে সবাই বলছে ইংরেজেরা এদেশ থেকে নির্মূল হবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে এখন একথা বোঝা উচিত যে ইংরেজ অধীনতা আর থাকবেনা এবং তাদের প্রত্যেকের উচিত বাদশাহী

শাসন দৃঢ়তর করে সর্বসাধারণের মঙ্গলসাধন। বর্তমান সুযোগ হেলায় হারালে সবাইকে অনুতাপ করতে হবে। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলেছেন,—'সুযোগ কখনও হারাতে নেই। সুযোগ নিয়ে আসে সৌভাগ্যের গোলক। যে বুদ্ধিমান সে তাকে আঁকড়ে ধরে, মূর্খেরা তাকে গড়িয়ে দেয় এবং নিজের অঙ্গুলী দংশন ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকেনা।' আশা করি জনসাধারণ কবির এই উক্তি স্মরণ রাখবে।

"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তাবেদারেরা নানা রকম ভুল বুঝাবার চেষ্টায় আছে, তাতে যেন কেউ না ভোলে। বর্তমানে যে দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করতে হবে বাদশাহী শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হলে সমস্তই দূর হবে।

"একথা সবাই জানে যে ব্রিটিশের অধীনে সামরিক ও বেসামরিক কাজে যে সকল ভারতীয় নিযুক্ত আছে তাদের বেতন অল্প, ক্ষমতা সামান্য এবং প্রতিপত্তি নেই বললেই চলে। যে-সব চাকুরীতে সম্মান আছে ও বেতন বেশী সেগুলি ব্রিটিশের জন্যেই একচেটিয়া। সামরিক চাকুরীতে একজন ভারতবাসী সারা জীবন কাজ করে বড় জোর ৬০।৭০ টাকা মাইনের একজন 'সুবেদার' পর্যন্ত উঠতে পারে। বেসামরিক চাকুরীতে একজন 'সদরালা'র উপরে আর কিছু হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। তার বেতন ৫০০ টাকা। না আছে কোন 'জায়গীর' না আছে কোন ইনাম। বাদশাহী চাকুরীতে ভারতীয়েরা সেনা বিভাগে 'পাঁচ হাজারী' সিপাহী সলার প্রভৃতি বড় বড় চাকুরী পাবে,

যেগুলি ব্রিটিশ বাহিনীতে এখন কর্ণেল, জেনারেল, কমাণ্ডার-ইন-চীফ প্রভৃতি নামে ব্রিটিশেরা পাচ্ছে। বেসামরিক বিভাগে ব্রিটিশ শাসনে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টার, সদর জজ, সেক্রেটারী, গভর্ণর সব ব্রিটিশেরা হচ্ছে। বাদশাহী শাসনে এই চাকুরীগুলি উজীর, কাজী, সফির, সুবা, নিজাম, দেওয়ান প্রভৃতি নামে ভারতীয়েরাই করবে। তারা জায়গীর পাবে, ইনাম পাবে, প্রভূত প্রতিপত্তি ভোগ করবে।

"সর্বশেষে এই কথাটা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা এর পরেও ব্রিটিশের পক্ষে থাকবে, তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হবে, জায়গা জমি বাজেয়াপ্ত হবে, পরিবার পরিজনসহ তাদেরকে বন্দী করা হবে এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।"

এই দীর্ঘ ইস্তাহারটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন ছিল। এই ইস্তাহারের মধ্যেই জনসাধারণের অভিযোগ ও বিদ্বেষের কারণগুলি লিপিবদ্ধ আছে এবং বিদ্রোহীরা যে নবব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিল তারও আভাস এর মধ্যেই পাওয়া যায়। বিদ্রোহের শক্তি ও অসুবিধা সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব এই ইস্তাহার থেকে।

তিন

বি দ্রো হে র ব্যা প্তি

বিদ্রোহের আসল নির্ভর ছিল সৈন্য। সেনাদল যেখানে অনুগত ছিল ব্রিটিশকে বেশী বেগ পেতে হয়নি সেখানে। মাদ্রাজ আর্মি পূরোপূরি এবং বোম্বে আর্মিরও একমাত্র হিন্দুস্থানী সৈন্যরা ছাড়া আর প্রায় সবটাই ব্রিটিশের প্রতি অনুগত ছিল। দাক্ষিণাত্যে এখানে ওখানে মাঝে মাঝে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তা নিয়ে বিব্রত হতে হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু শঙ্কিত হতে হয়নি।

৩২,৩১১ সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহ করল এই দলগুলি ;— গোয়ালিয়র : ৮৪০১, কোটা : ১,১৪৮, ভূপাল : ৮২৯, মালওয়া ইউনাইটেড: ১৬১৭, যোধপুর লিজিয়ন : ১২৪৬। বেঙ্গল আর্মিতে মধ্যভারতের যে সৈন্যদল ছিল তার মধ্যে ক্ষুদ্র দুটি ভীলদল ছাড়া সবাই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও বরোদার সেনাবাহিনী সাদার্ণ আর্মির পদাঙ্কানুসরণ করল।

বেঙ্গল আর্মিই বিদ্রোহের আহ্বানে সাড়া দিল সব চেয়ে বেশী। এর অধীনে যতগুলি ঘাঁটি ছিল, একটির পর একটি করে সেগুলিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল চৈত্রদিনের আগুনের মত। মাত্র এগারোটি পদাতিক দল গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুগত রইল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের দিল্লী, মীরাট, রোহিলাখণ্ড, আগ্রা, বেনারস ও এলাহাবাদ বিভাগে, নিম্ন বাঙলায় পাটনা ও ছোট-নাগপুরে, এবং মধ্যভারতে নীমাচ ও আজমীরে সামরিক আইন জারী করতে হয়েছিল। বিদ্রোহের ব্যাপকতা এ থেকেই অনেকটা আঁচ করা যাবে। পাঞ্জাব ও অযোধ্যায় সামরিক আইন জারী না করেও কর্তৃপক্ষ এমন আচরণ করলেন যেটা সামরিক আইনের আওতায়ই শুধু সম্ভব। ১৮৫৭ সালের জুন মাসের মধ্যে অযোধ্যায় সুশিক্ষিত বিদ্রোহী সেনাদলের সংখ্যা দাঁড়াল ২৫,০০০. দিল্লী ও দিল্লীর আশেপাশে ৩০,০০০ এবং মধ্যভারতে প্রায় ৫০,০০০। দিল্লী, অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড, বুঁদেলখণ্ড থেকে বিদেশী শাসন উৎপাটিত হলো। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি এবং পশ্চিম বিহার তীব্র সংগ্রামের ক্ষেত্র হয়ে উঠলো। বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে সার্ রিচার্ড টেম্পল ইটালী থেকে দ্রুত ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন। এসে দেখলেন "পশ্চাতে প্রবেশের সমুদয় পথ অবরুদ্ধ"। (রিচার্ড টেম্পল প্রণীত 'মেন এ্যাণ্ড ইভেণ্টস্ অব মাই টাইম ইন ইণ্ডিয়া' পৃঃ ১২৭)। পারস্য থেকে সেনাপতি হেভলক জলপথে কলকাতায় ফিরতে বাধ্য হলেন কারণ স্থলপথে দিল্লী যাওয়ার সম্ভাবনা তখন লুপ্ত।

দেশের কোন কোন অংশে বিদ্রোহ গণবিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল। জি. বি ম্যালেসন তার 'হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি' বইতে লিখেছেন, "আমাদের সাম্রাজ্যের চারিটি প্রধান

প্রদেশে—অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড, সাগর ও নর্মদা অঞ্চলে জনসাধারণের বেশীর ভাগ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। পশ্চিম বিহার, পাটনা বিভাগের অনেকগুলি জেলায়, আগ্রা ও মিরাট বিভাগে গণ বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ প্রায় একই সময়ে সংঘটিত হয়েছে।"

সমগ্র রোহিলাখণ্ডে বিদ্রোহ ঘটল এক দিনে। বেরিলী, সাজাহানপুর, মোরাদাবাদ, বুদাওন ও অন্যান্য জেলা-সহরে পুলিশ, সৈন্যদল ও নাগরিকেরা একযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং কয়েক প্রহরের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটালো। এর জন্য এক ফোটা রক্তপাত হয়নি। "রোহিলাখণ্ড পরাধীন"—একথা না বলে সবাই বলল "রোহিলাখণ্ড স্বাধীন" এবং সবাই দেখল বলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সত্যি সত্যি স্বাধীন হল। (ভি. ডি. সাভারকার লিখিত "ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স")। ভারতের অন্যত্র সবাই ভাবলো, রোহিলাখণ্ডে যা সম্ভব, অন্য জায়গায়ও তা নিশ্চয়ই সম্ভব।

যমুনার পশ্চিম তীরে কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী দেশীয় রাজা তাঁদের প্রজাদের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত রেখেছিল। কিন্তু দোয়াব গ্রামের লোকেরা এবং গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী জনসাধারণ অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করেছিল। J. K. Kaye তাঁর ইণ্ডিয়ান মিউটিনি গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"শুধু গঙ্গার ওধারের জেলাগুলিতেই নয়, দুই নদীর মধ্যবর্তী সমুদয় গ্রামের লোকেরাও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে

ঐ সকল অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে এমন একটি প্রাণীও ছিল না যে আমাদের বিপক্ষে রুখে না দাঁড়িয়েছে।” অযোধ্যায় সিপাহীরাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করল। যে জেলায় সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে সে জেলাই ইংরেজের হাতছাড়া হয়েছে। “৪ঠা থেকে ১৪ই জুন—এই দশদিনের মধ্যে অযোধ্যা থেকে ব্রিটিশ শাসন স্বপ্নের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। সেনাদল বিদ্রোহ করতেই জনসাধারণ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু কোন অত্যাচার বা নিষ্ঠুরতা করেনি তারা।” (জি. ডব্লিউ ফরেষ্ট লিখিত ‘এ হিষ্ট্রী অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি’, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭)।

স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে অযোধ্যার নরনারী নতুন উন্মাদনা বোধ করল। দেখতে দেখতে একলক্ষ লোক অস্ত্রধারণ করল। সিপাহীরা তো ছিলই। প্রায় পনেরশ’ দুর্গ ছিল এই অযোধ্যা প্রদেশে। বিদ্রোহীরা অনেক গ্রামকেও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করল।

মধ্যভারত সম্পর্কে লর্ড ক্যানিং লিখেছিলেন, “মধ্যভারতকে আমি বাদ দিয়েই রেখেছি। পুনর্বার দখল করতে হবে একে।”

ব্রিটিশ শাসনের বিলুপ্তি কোন কোন অঞ্চলে এমন নিখুঁত হয়েছিল যে কলকাতায় স্থিত কর্তৃপক্ষ আগ্রা থেকে সোজাসুজি কোন খবর পাচ্ছিলেন না। বোম্বাই কিম্বা লাহোর হয়ে তবে সে সংবাদ কলকাতা আসছিল।

দিল্লী অধিকার

বিদ্রোহীরা সবচেয়ে বিস্ময়কর সাহসিকতার পরিচয় দিল দিল্লী অধিকারের দ্বারা। দিল্লীজয়ের ফলে বিদ্রোহীরা পেল একটা মর্যাদা, একজন নেতা, একটি নিজস্ব পতাকা এবং একটা মহান লক্ষ্য। দিল্লী ভারতের রাজধানী, ঐ নামের একটা মোহ আছে। সুতরাং দিল্লী জয়ের ফলে বিদ্রোহীরা জনসাধারণের চোখে ক্ষমতা ও অধিকারের প্রতীকরূপে পরিগণিত হলো। তা ছাড়া দিল্লী অধিকারের দ্বারা বিদ্রোহীদের শক্তিও বৃদ্ধি পেল অনেকাংশে। দিল্লীর অস্ত্রাগারে ৯০০,০০০ কার্তুজ, ৮,০০০ কামান, ১০,০০০ বন্দুক, ও ১০,০০০ পিপে ভর্তি বারুদ ছিল। এসমস্তই বিদ্রোহীদের হস্তগত হলো।

দিল্লীতে বিদ্রোহীরা যে প্রতিরোধ শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তা বিস্ময়কর। ইতিপূর্বে উত্তর সীমান্ত পথে শক, হূণ দল, পাঠান মোগল বারে বারে হানা দিয়েছে ভারতবর্ষে. দখল করেছে দিল্লী। তারা কখনও এমন তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি, যেমন হয়েছে ব্রিটিশ বিদ্রোহের পরে দিল্লী দখলের প্রয়াসে। শুধু সিপাহীরা নয়, জনসাধারণ একযোগে মরণপণ করে লড়েছে দিল্লী রক্ষাকল্পে। ব্রিটিশের আক্রমণ তরঙ্গ বারে বারে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে দিল্লীর নগর প্রাচীর থেকে। অবশেষে যেদিন দিল্লীর পতন ঘটলো, ব্রিটিশ সৈন্য প্রবেশ করল নগরে, সেদিনও রাজধানীর প্রতি পথে চলেছে যুদ্ধ, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত

ভূমিও দখল করতে পারেনি ইংরেজসেনানী। এমন কি দিল্লীর যুদ্ধ সমাপ্তির বহু পরেও আশেপাশের গ্রামে জনসাধারণ দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছে। প্রতি গ্রামে তারা পরিখা কেটেছে, দুর্গ তৈরী করেছে, সৈন্যদল গঠন করে বীর বিক্রমে বাধা দিয়েছে বিদেশী সৈন্যদের।

টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা উইলিয়ম হাওয়ার্ড রাসেল তখন এদেশে ছিলেন। তিনি তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন, "বারাণসীর পথে পথে যেখানে ভারতীয়দের দেখেছি, সবারই চোখে মুখে ব্রিটিশ বিদ্বেষের সুস্পষ্ট চিহ্ন। বিহারে জনসাধারণ সর্বদা ভুল খবর দিয়ে ব্রিটিশদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছে। বিদ্রোহীরা সর্বত্র সর্বসাধারণের কাছ থেকে পেয়েছে সমর্থন, সহানুভূতি ও সাহায্য। তাদের রসদ ফুরিয়ে গেলে গ্রামের লোকেরা সাগ্রহে দিয়েছে খাবার, তাদের মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গেলে তারাই করেছে তার রক্ষণাবেক্ষণ। ব্রিটিশ শিবিরের আশেপাশে যারা রয়েছে তারা বিদ্রোহীদের সমস্ত সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে। ব্রিটিশের পক্ষে এমন কোন পরিকল্পনা, এমন কোন যুক্তি পরামর্শ ছিলনা যা' বিদ্রোহীদের কানে গিয়ে পৌঁছয়নি।"

অযোধ্যা বিহার প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে শুধু সিপাহীরা নয়, পুলিশ এবং অন্যান্য দেশীয় কর্মচারীরাও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। এমন কি ধনশালী ব্যক্তিরা যারা স্বভাবতঃই বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যায়, তারাও ব্রিটিশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসন অটুট ছিল।

কিন্তু সেখানেও গভর্ণমেণ্টের শক্তি সম্পর্কে সাধারণের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল। ছয়টাকা সুদে দশ লক্ষ পাউণ্ডের এক সরকারী ঋণের সামান্য অংশ মাত্র গভর্ণমেণ্ট তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ধন সম্পত্তির ধ্বংস ও লুণ্ঠনের ফলে সরকারী ধনাগারের ক্ষতি, রাজস্ব অনাদায়ের লোকসান ইত্যাদি নিয়ে ১৮৫৭ সালে গভর্ণমেণ্টের ঘাটতি হয়েছিল প্রায় দেড় কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি। বিদ্রোহ দমনের ব্যয় নিয়ে ভারতের সরকারী ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল ৪ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ডে। বিদ্রোহের ফলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের আস্থা গেল কমে। সরকারী জামিনের দাম হ্রাস পেল অভাবিতরূপে। কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ থেকে ৭৫ ভাগ পর্যন্ত তার দাম পড়ে গেল। ১৮৫৭ সালে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল কোম্পানীর কাগজের জামিনে টাকা ধার দিতেই অস্বীকার করল।

দেশের আভ্যন্তরীন বাণিজ্য অত্যন্ত মন্দা, বিলাত থেকে আমদানী একরকম বন্ধ বললেই হয়। মহাজন ও ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রেই কাজ-কর্ম প্রায় তুলে দিয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বিশেষ করে চালের দাম বেড়ে গিয়েছে অসম্ভব রকম। কিন্তু বিদ্রোহের ব্যাপকতা বিচার করলে এ সবই অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে হবে।

হতাহতের পরিমাণ

বিদ্রোহের প্রথম বারো মাসে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ৩০,০০০ সিপাহী নিহত হয়েছে। ব্রিটিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বেসামরিক জনসাধরণের মধ্যেও প্রায় ১০,০০০ লোক নিহত হয়েছে। বিদ্রোহের শাস্তি হিসাবে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে, কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত ভয়াবহরূপে অধিক। বিদ্রোহ দমনের পরে হিসাব করে দেখা গেছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, আঘাত জনিত মৃত্যু, বিচারে ফাঁসি ইত্যাদি মিলিয়ে সহস্র সহস্র সিপাহীর জীবনান্ত হয়েছে, সব শুদ্ধ দু' লক্ষ লোক জন্মভূমির উদ্ধার সাধনে প্রাণ দিয়েছে। নীচের তালিকা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হবে যে ব্রিটিশ যে-সব যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করেছে সে সবগুলির হতাহতের সংখ্যা মিলিয়েও শুধুমাত্র সিপাহী বিদ্রোহে নিহতদের সংখ্যার নিকটেও পৌঁছোতে পারে না।

বৎসর	যুদ্ধ	সৈন্যক্ষয়	
		ব্রিটিশ পক্ষে	ভারতীয় পক্ষে†
১৭৫৭	পলাশী	৭২*	১,০০০*
১৭৬৪	বক্সার	৮৪৭	২,০০০
১৮০৩	আসাই	২,০৭০	১,২০০
১৮০৩	লাসাওয়ারি	৮৩৮	১,৫০০

* আহতদের সংখ্যা ধরে

† আনুমানিক সংখ্যা

বৎসর	যুদ্ধ	সৈন্যক্ষয়	
		ব্রিটিশ পক্ষে	ভারতীয় পক্ষে†
১৮১৮	খাদবী	৮৬	৫০০
১৮১৮	মাহিদপুর	৭৯৭	৩,০০০
১৮৪৩	মীয়ানি	২৭৫	৬,০০০*
১৮৪৩	মহারাজপুর	৭৭৮	৩,০০০
১৮৪৫	ফিরোজশাহ	২,৪১৫	৭,০০০
১৮৪৫	সোব্রাওন	২,৩৮৩	৭,০০০
১৮৪৮	চিলিয়ানওয়ালা	২,৪৪৬	৫,০০০
১৮৪৮	গুজরাট	২,৪০০	৫,০০০
	মোট	১৫,৪০৭	৪২,২০০

অর্থ ও লোকক্ষয়ের এই বিরাট পরিমাণের দ্বারাই বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও শক্তি অনুধাবন করা যায়। সমসামযিক ইউরোপীয় সংঘর্ষগুলির সঙ্গে তুলনা করলে এই গণবিদ্রোহের প্রকৃত রূপটি আমাদের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হবে। বিদ্রোহীদের অধিকারে ১০০,০০০ বর্গমাইল ব্যাপী স্থানের জনসংখ্যা ছিল ৩৮,০০০,০০০। সমগ্র ইটালীর লোকসংখ্যাও প্রায় তাই। ব্রিটিশ পক্ষের হতাহতের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় যে ক্রীমিয়ার যুদ্ধে রুশেরা যে বিক্রমে যুদ্ধ করেছিল বিদ্রোহীদের সংগ্রাম তারই সমতুল্য। লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীদের ৩৬,০০০ ব্রিটিশ সৈন্যের

* আহতদের সংখ্যা ধরে

† আনুমানিক সংখ্যা

সম্মুখীন হতে হয়েছে। সিবাস্তপোলে অবরোধকারীরা মাত্র ২৬,০০০ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

কাজে কাজেই ১৮৫৭ সালের সংঘর্ষকে শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে গণ্য করা ভ্রম। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সেই ছিল ভারতীয়দের এক মরণপণ সংগ্রাম। তাতে তারা পরাজিত হয়েছে, কিন্তু বীরের ন্যায় লড়েছে, এবং বীরের ন্যায় মরেছে। ভারতীয় বীরত্বের প্রাচীন ঐতিহ্য তারা রক্ষা করেছে। জাতির কাছে বরণীয় তাঁরা, স্মরণীয় তাঁদের স্মৃতি ও কীর্তি।

চার

বিদ্রোহের প্রকৃতি

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এই সংগ্রামকে শুধু 'সিপাহীদের বিদ্রোহ' বলে একটা সামান্য ঘটনারূপে প্রমাণ করতে ব্যস্ত। সার জন সিলী লিখেছেন, "এই বিদ্রোহ পুরোপুরি স্বার্থপ্রণোদিত। দেশপ্রীতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কোন দেশীয় নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ঘটেনি, দেশের জনসাধারণ একে সমর্থনও করেনি।" যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকেই এরকম সরাসরি সহজ আখ্যা দেওয়া ভুল। ঘটনা ঘটে নানা কারণে, নানা প্ররোচনায়, কিন্তু একটা ব্যাপক ব্যাপারের অন্তরালে বহু-বিধ কারণ থাকা সত্বেও তার মধ্যে এমন একটা মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় যাকে অবলম্বন কোরেই বহুসংখ্যক লোকের কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পশ্চাতেও এমনি একটি মূল সুর ছিল যা সংগ্রামে লিপ্ত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিদ্রোহের প্রধান অবলম্বন ছিল সিপাহীরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণও করেছে তারাই। দেশের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষের বন্যা বিক্ষিপ্ত ভাবে নষ্ট না হয়ে একটি মূল ধারায় প্রবাহিত করার কৃতিত্বও তাদের। তারাই আঘাত হেনেছে, এবং আঘাত সয়েছে। বিদ্রোহে তারা নিজেদের

প্রাধান্য প্রমাণের চেষ্টা করেছে তাতেও সন্দেহ নেই। সে সময়ে চল্‌তি ঘোষণাই ছিল ঃ

খালেকে খোদা,
মালিকে বাদশা,
হুকুমে সিপাই।

জাতীয় বিপ্লব

কিন্তু সিপাহী ছাড়াও অগণিত জনসাধারণ বিদ্রোহে মনে-প্রাণে যোগ দিয়েছে। নিহতদের তালিকায় দেখা গেছে সিপাহী ও সাধারণ লোকের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্রোহে জনসাধারণ যে যোগ দিয়েছিল তার পশ্চাতে কোন চাকুরীর প্রশ্ন বা অন্য অভিযোগ, অভিমান ছিল না। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়েই তারা বিদেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল।

এ বিদ্রোহ শুধু যে সেনাবিভাগে সিপাহীদের একটা অসন্তোষের পরিচয় মাত্র নয়, এটা যে দেশের গণবিদ্রোহ তার একাধিক প্রমাণ আছে।

বিদ্রোহ সর্বত্র পরিচালিত হয়েছে এক নেতার নামে, এক পতাকার নিম্নে। নানা সাহেব, অযোধ্যার বেগম, ঝাঁসির রাণী, বেরিলীর খাঁ বাহাদুর খাঁ প্রভৃতি রাজ্যচ্যুত নৃপতিরা সবাই দিল্লীর মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে বিদ্রোহের নেতৃত্ব

করেছেন। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন রূপে তাঁরা নিয়মিত তাঁকে সংবাদ প্রেরণ করেছেন, নজরানা পাঠিয়েছেন। "দিল্লী চলো, চলো দিল্লী" ধ্বনি নিয়ে বিদ্রোহীরা সর্বত্র অগ্রসর হয়েছে, সম্রাটকে তাঁদের নেতা বলে গ্রহণ করেছে।

বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও বিস্তার বিচার করলে সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে, এই বিদ্রোহ সর্বসাধারণের। জনগণের সক্রিয় সমর্থন না থাকলে এত অল্প সময়ে এত বিপুল পরিধি নিয়ে বিদ্রোহ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারত না। মীরাট ও আলিগড়ে জনসাধারণই সেনাদলকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করেছিল। যারা ব্রিটিশের পক্ষ নিয়েছে তারা সাধারণের ঘৃণার পাত্র হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক লাঞ্ছনাও ভোগ করেছে, যেমন পাটনায়। যেখানে জনসাধারণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহে যোগ দিতে সাহস করেনি সেখানে তারা ব্রিটিশের সঙ্গে অসহযোগ করেছে। সেনাপতি হ্যাভলক তাঁর সৈন্যদের নদী পার করতে একটি নৌকা, একজন মাঝিও সংগ্রহ করতে পারেননি। কানপুরে ব্রিটিশেরা একদল মজুরকে ভয় দেখিয়ে কাজে নিযুক্ত করেছিল। রাত্রিতে তারা সবাই পালিয়ে গেল। এ্যানসন দিল্লীর পথে সৈন্য নিয়ে যাওয়ার কালে ব্যবসায়ী, মহাজন, জনসাধারণ কারো কাছ থেকেই বিশেষ সাহায্য পাননি। যেই মাত্র কোনো জায়গায় ব্রিটিশ শাসন বিধ্বস্ত হয়েছে অমনি সেখানকার জনসাধারণ অস্ত্র নিয়ে দেশ রক্ষায় এগিয়ে এসেছে।

PICTURE POST

ইংরেজ ভারতে এসেছিল বণিকের বেশে। তারপর ধীরে ধীরে বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী। তার বাণিজ্যের জাহাজ আজও চলছে অপ্রতিহত। সিপাহীরা চেয়েছিল মানদণ্ড এবং রাজদণ্ড দুইই ধুলায় লুটিয়ে দিতে।

রোহিলাখণ্ড থেকে সেনাপতি বখ্‌ত খান সিপাহী নিয়ে রওনা হলেন দিল্লীতে। জনসাধারণ অমনি নিজেদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রোহিলাখণ্ডের রক্ষার ভার গ্রহণ করল।

সাম্প্রদায়িক মৈত্রী

বিদ্রোহের জাতীয় রূপটি সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর ব্যাপকতায়। দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে তা অভূতপূর্ব। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আশা করেছিলেন সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি জাগিয়ে তুলে সেই অতি সনাতন "ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল" নীতির দ্বারাই এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবেন। ১৮৫৭ সালের ১লা মে সার হেনরী লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তাতে আছে, "দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ বাধবে আমি তার অপেক্ষায় আছি।" আগ্রার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর রাসেল কলভিন বিদ্রোহের খবর পেয়েই গোয়ালিয়র ও ভরতপুরে জাঠ এবং মারাঠাদের তাদের পুরানো শত্রু মুসলমানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তুলবার যাবতীয় কলা-কৌশল ও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো। এইচসন্ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছেন, "এক্ষেত্রে মুসলমানদের আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে ব্যর্থ

হয়েছি।" ব্যর্থতার কারণ এই যে, উভয় সম্প্রদায়ের জনগণই বিদেশী শাসন অবসানের এক অদম্য বাসনায় উৎপ্রাণিত হয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে, একে অন্যের ধর্মমত ও বিশ্বাসের প্রতি অসাধারণ ঔদার্য প্রকাশ করতে স্বরু করেছিল।

বেরিলীর বাহাদুর খান যে ঘোষণা প্রচার করেছিলেন, তাতে তিনি বললেন,—"হিন্দুরা যদি ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার কার্যে মুসলমানের সহায়তা করে, তবে মুসলমান প্রধানেরা দেশে গো-কোরবানী বন্ধ করে দেবেন। গোমাংসকে হিন্দুরা যেমন ঘৃণা করে মুসলমানেরাও তেমনি করবে, যেমন শুকরের মাংসকে তারা বর্তমানে ঘৃণা করে।" সম্রাট হিন্দুদের যোগ দেওয়ার কোনো সর্ত পর্যন্ত রাখেননি। তিনি সরাসরি গোহত্যা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। দিল্লী থেকে অযোধ্যার সিপাহীরা ব্যারাকপুরে তাদের বন্ধুদের কাছে লিখে জানাল, "ভাই রে, সম্রাট দেশে গোহত্যা বন্ধ করে দিয়েছেন।"

এর চাইতেও বিস্ময়কর ত্যাগের নিদর্শন দেখালেন সম্রাট। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর ও আলোয়াড় প্রভৃতি হিন্দু রাজাদের কাছে সম্রাট স্বহস্তে যে-পত্র লিখেছিলেন এইখানে তাঁর অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সম্রাট লিখলেন ঃ

"যে কোনো উপায়ে হিন্দুস্থান থেকে ফিরিঙ্গীদের তাড়িয়ে দেওয়াই আমার অভিলাষ। সমগ্র হিন্দুস্থান স্বাধীন হোক, এই আমার ইচ্ছা। কিন্তু দেশের জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে

পাশে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পারে, তাদের শক্তিকে যথাযথরূপে নিয়োজিত করতে পারে, আন্দোলনের ভার বহনে সক্ষম, এমন একজন নেতা এগিয়ে না এলে বিদ্রোহ সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের পরেও রাজত্ব করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই আমার। যদি আপনারা সমস্ত দেশীয় নৃপতিরা মিলে শত্রুকে তাড়াতে অস্ত্র ধারণ করেন তবে আপনাদের সম্মতিক্রমে গঠিত যে-কোন নৃপতি মণ্ডলের হস্তে শাসনভার অর্পণ করে সিংহাসন ত্যাগে আমি প্রস্তুত।" (সি, টি, মেটকাফ রচিত "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্," পৃঃ ২২৬)।

হিন্দুরাও মুসলমানের বন্ধুত্ব অর্জনে সমপরিমাণ আগ্রহ ও ঔদার্য দেখিয়েছে। কানপুরে নানা সাহেব যখন তাঁর পৈতৃক পতাকা 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' উত্তোলন করলেন তখন তার পাশে ছিল অর্ধচন্দ্র-অঙ্কিত মুসলিম পতাকা। তিনি যে ঘোষণা প্রচার করলেন তাও সম্রাট বাহদুর শাহের নামে। নেপালের মহারাজা জং বাহাদুরের সঙ্গে সে সময় তার যে পত্র ব্যবহার হয়েছে, তার সবগুলিতেই ছিল হিজরী সালের তারিখ। নানা সাহেবের উপদেষ্টা এবং মন্ত্রী ছিলেন একজন মুসলমান—আজিমুল্লা খান্। বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত একই সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে রণক্ষেত্রকে রঞ্জিত করেছে।

এ সবই প্রমাণ করে দেয় বিদ্রোহের সর্বাঙ্গীন জাতীয় প্রকৃতি। শিখেরা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ইংরেজের সহায়তা

করেছে বটে, কিন্তু সে অনেক পরে। এইচসন নিজের রচনায় স্বীকার করেছেন, দিল্লীর পতন ঘটবার আগে শিখেরা ইংরেজের দলে বড় বিশেষ যোগ দেয়নি। বিদ্রোহের এই সর্ব-ভারতীয় ও জাতীয় প্রকৃতিই ইংরেজকে সব চেয়ে বেশী চিন্তিত করেছে। সার জর্জ ক্যাম্পবেল লিখেছেন, "বিদ্রোহের পর লর্ড ক্যানিং সিপাহীদের করুণা দেখিয়েছেন। কিন্তু বেসামরিক যে সব লোক বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছে তাদের তিনি দিয়েছেন কঠোর শাস্তি।"

"স্বরাজ" এবং "স্বধর্ম"—এ দুই লক্ষ্য ছিল বিদ্রোহীদের। ধর্ম সম্পর্কিত অভিযোগগুলি বিদ্রোহের আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছে যথেষ্ট। প্রত্যেক বিদ্রোহী বাহিনীতেই সৈন্যদের ধর্ম-কর্মের সুবিধার জন্য একজন করে মৌলবী ও পুরোহিত থাকতো। এদের অনেকেই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিদ্রোহীর পক্ষে গুপ্তচরের কাজ অনেক সময়েই করেছে ফকিরেরা।

কিন্তু ধর্ম এ বিদ্রোহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার জন্য, তা কখনও ধর্মান্ধতার সৃষ্টি করেনি। খ্রীষ্টানেরা কেউ তাদের ধর্মমতের জন্য উৎপীড়িত হয়নি। যারা ইংরেজের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে তারা অবশ্য অত্যাচারিত হয়েছে। শুধু খ্রীষ্টানেরা নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও যারা ইংরেজী শিক্ষার ফলে ব্রিটিশের পক্ষাবলম্বন করেছে, তারাও বিদ্রোহীদের কাছে খাতির পায়নি। হোমস্ লিখেছেন, "দেশীয়দের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী শিখেছে, বিশেষ করে খ্রীষ্টানেরা, তাঁরা আমাদের প্রতি অনুগত রয়েছে।"

এই বিদ্রোহ মূলতঃ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক নেতারাই তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন, ধর্মগুরুরা নয়। যেখানেই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের উচ্ছেদ হয়েছে সেখানেই পূর্ববর্তী রাজা বা তার বংশধরকে এনে রাজ্যভার অর্পণ করা হয়েছে। শুধু রাজা নয় জমিদারও তার নষ্ট সম্পত্তি ফিরে পেয়েছে, এবং সেও বিদ্রোহ পরিচালনা করেছে, সংগ্রাম চালিয়েছে।

কিন্তু প্রকৃতির মতো ইতিহাসেও কোনো কিছুই পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে আসেনা। গোড়াতে যা নিয়ে আন্দোলন স্থুরু হয় শেষ পর্যন্ত তাতেই তা একান্তভাবে আবদ্ধ থাকেনা। তার গতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়। যে চর্বির কার্তূজ নিয়ে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ঘটেছিল, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সেই কার্তূজই তারা পরে বিনাদ্বিধায় ব্যবহার করেছে। (এডমণ্ড, সি, কক্স লিখিত, "এ সর্ট হিষ্ট্রি অব বম্বে প্রেসিডেন্সী")। ঐ রকম একটি ব্যাপক বিপ্লব আধুনিকতার ভাবধারা দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত না হয়েই পারেনা। সিপাহী বিদ্রোহে এমন অনেক ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে-গুলি আধুনিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার অনুকূল।

গণতন্ত্রের লক্ষণ

দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীরা যে গভর্ণমেন্ট গঠন করেছিল তাতে গণতন্ত্রের ছাপ ছিল। দিল্লীর গভর্ণমেন্টে সম্রাট অনেকটা

আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক রাজা—কনষ্টিটিউশন্যাল মনার্কীর মতো ছিলেন। পার্লামেণ্টের বদলে বিভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়ে তিনি একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। সেই সমিতিই রাজশক্তির উৎসরূপে গণ্য হতো। আরবি বা ফার্সী সংজ্ঞা ও নিয়মপত্র ব্যবহার না করে ইংরেজী নাম-ধামগুলিই বজায় রাখা হয়েছিল। আবেদন-নিবেদন যদিও সবই রাজার নামে লিখিত ও প্রচারিত হতো, সে-পত্রগুলি "কোর্ট" নামে একটি সমিতির কাছে পেশ করা হতো। সমিতির সদস্য ছিল কয়েকজন কর্ণেল, একজন ব্রিগেড জেনারেল ও সেক্রেটারী। সিপাহীদের মধ্যে যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাঁরাই এই কর্ণেল পদে উন্নীত হতো।

অযোধ্যাপতি বয়সে নাবালক ছিলেন বোলে রাজ্যশাসনের ভার ছিল কাউন্সিল অব ষ্টেট—রাষ্ট্রিয় সভা—ও একজন মন্ত্রীর উপরে। রাষ্ট্রীয় সভা গঠিত হয়েছিল ভূতপূর্ব রাজার পুরাতন কর্মচারী, দেশের প্রধান সামন্ত ও তালুকদার এবং সিপাহীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে। "ইণ্ডিয়া আণ্ডার ব্রিটিশ রুল, ১৮৮৬" নামীয় গ্রন্থে ট্যালবাস হুইলার লিখেছেন,—সিপাহীরা নিজেরাই নির্বাচনের দ্বারা অফিসার ঠিক করতো এবং অফিসারেরা জেনারেল মনোনীত করতো। সেনাবাহিনীর মধ্যে বেতনের তারতম্য ব্রিটিশের অধীন ভারতীয় বাহিনীর তুলনায় অতি সামান্য ছিল। একজন কর্ণেল ও একজন মেজর সমান বেতন পেত—৫০০ টাকা। একজন সামান্য 'সওয়ার' পেত ২১ টাকা। বিদ্রোহের

দ্বারা সেনাবাহিনীতে অনেকটা গণতান্ত্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই যে, বিদ্রোহের এই গণতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিল সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার মিলনের মধ্যেই ছিল বিদ্রোহের আসল গলদ। মাঝে মাঝে এদের সংঘর্ষ যে না বেঁধেছে তা নয়, কিন্তু গণতন্ত্র নিশ্চিতরূপে জয়ী হতে পারেনি। ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন আদালতের দ্বারা সকল মানুষকে একই ক্ষেত্রে টেনে নামাবার যে নীতি প্রচলিত হয়েছিল, তা সামন্ত ও উচ্চশ্রেণীর লোকের কাছে রুচিকর ছিলনা। একজন সাধারণ রায়ত, ঝি বা চাকর কাছারীতে নালিশ করলে জমিদারকে কাছারীতে হাজির হতে হয়, গ্রেপ্তার বা জেলে যেতে হয়—এ ব্যবস্থা ভূম্যধিকারীদের মনোমতো হতে পারেনা। কাজেই সিপাহী ও সাধারণ লোকের গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিস্তৃতি তারা খুব প্রীতির চোখে দেখেনি। যে-সব জমিদার আসল মালিকদের হাত থেকে জমিজমা ফিরে নিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেনি, তারাই পরে সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে। সিপাহীরা সরকারী দলিলপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার উপক্রম করলে তারাই বাধা দিয়ে বলেছেন, "আহা, হা, কর কী? ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেওয়ার পরে এই দলিল পত্রগুলি না থাকলে লোকের দেনা পাওনা মিটবে কেমন কোরে?"

যদিও বিদ্রোহ ঋণগ্রস্ত, নির্যাতিত জনসাধারণকে তাদের

অভিযোগ প্রকাশের একটা সুযোগ দিয়েছিল, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে বঞ্চিত ও শোষণক্লিষ্ট জনগণের পরিপূর্ণ বিদ্রোহ বা বিপ্লব সেটা নয়। সে সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে বোঝা যাবে যে, সে-রকম বিপ্লব তখন সম্ভবই ছিলনা। কিন্তু বিত্তশালী লোকেরা ওরই মধ্যে ঝড়ের সঙ্কেত পেয়েছিলেন, আকাশে আগামী বিপ্লবের ঘনঘটা তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই গণবিপ্লবের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত রাজ রাজারা একে একে ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। তাদের রাজভক্তির আসল কারণ ঐখানে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের চিত্রটি বহু বর্ণের সমাবেশে রচিত। তাতে সামন্ততন্ত্রের উস্কানী ছিল, জনজাগরণের দুর্বার গতিবেগ ছিল, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার আকুল আবেগ ছিল, আর ছিল ধর্ম ও সামাজিক পীড়নের অসন্তোষ। সব কিছু মিলেই সেই সংগ্রামের সৃষ্টি।

পাঁচ

বিদ্রোহের নায়কেরা

বিদ্রোহের নায়কদের মধ্যে যারা সফলকাম হন পৃথিবীতে তারা রাজনীতিক বলে প্রখ্যাত হন, আর যারা ব্যর্থ হন তারা অপরাধীরূপে বিচারশালায় অভিযুক্ত হন। বিচারে তাদের কারো ভাগ্যে সুদীর্ঘ কারাবাস, অসহ্য নির্যাতন আর কারো বা হয় প্রাণদণ্ড। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিকেরা এই ব্যর্থকাম বিদ্রোহীদের চিত্রিত করে সাধারণ দস্যুরূপে, অকুণ্ঠিতচিত্তে কালিমা-কলঙ্কিত করে তাদের চরিত্র। তাদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান, পরবর্তীকালে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসার ফলে তাদের অপবাদ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, আর যারা হতভাগ্য, যুগযুগান্তর ধরে মিথ্যা কলঙ্কের ডালি নিয়ে বেঁচে থাকে তাঁরা ইতিহাসের পাতায় এবং প্রচারকার্যরত শাসকবর্গের অসত্য রটনায়। জগতের সমস্ত বিদ্রোহীদের এই ললাটলিখন।

১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের নায়কেরাও কেউ এ বিধান এড়াতে পারেন নি। পক্ষপাতহীন ঐতিহাসিকেরা এদের অনেকের মধ্যেই যে শৌর্য, সংগঠন শক্তি ও নেতৃত্বের মহিমা ছিল তা স্বীকার করেছেন। রাতারাতি এঁরা কেউ প্রাধান্য লাভ করেন নি। দীর্ঘকালব্যাপী আয়োজন ও প্রস্তুতির দ্বারা তারা এই বিদ্রোহের অবতারণা করেছিলেন এবং অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে সেই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছেন।

বিদ্রোহ সংঘটনে নায়কদের মধ্যে কে কী অংশ গ্রহণ করেছিলেন আজ তা জানার উপায় নেই। কেমন করে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের এক করা হয়, কী ভাবে পরস্পরবিরোধী মত ও দাবির সমন্বয় সাধন হয়, আজ তা বলা সম্ভব নয়। তবে জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য তাঁরা যে-সকল উপায় অবলম্বন করেছিলেন সেগুলি বিচার করলে একথা বুঝতে কষ্ট হয়না যে জনসাধারণের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। লাল পদ্ম ও রুটি এক হাত থেকে আর এক হাতে চালান করে দিয়ে বিদ্রোহের যে সঙ্কেত তাঁরা দেশের সর্বত্র প্রচারিত করেছিলেন তা কম চাতুর্যপূর্ণ নয়।

বিদ্রোহের সংগঠন ব্যবস্থায় নানাসাহেব ও আজিমুল্লা খাঁন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিদ্রোহের অল্প কয়দিন পুর্বে তাঁরা দু'জনে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। সে সময়ে বিচ্ছিন্ন অথচ বিদ্রোহোন্মুখ শক্তিগুলিকে তারা একত্র সংহত করেছিলেন বলে মনে হয়।

নানাসাহেব (১৮২৪—?) ইংরেজদের মধ্যে একজন আরামপ্রিয়, মোটা বুদ্ধির মজলিসী প্রকৃতির লোক ব'লে খ্যাত ছিলেন। তাঁর আতিথেয়তার খ্যাতি ছিল বহু-বিস্তৃত, তার প্রমোদ উৎসব ও ভোজসভাগুলি ছিল ইংরেজ মহলে আলোচনার বিষয়। ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে নানাসাহেবের ভোজের আয়োজনগুলি সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার জাঁকজমক,

ব্যয়বাহুল্যও বেড়েছিল বহুগুণ। বাইরের দিলদরিয়া ও আয়েসী আবরণের অন্তরালে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, অসাধারণ ধৈর্য, প্রখর কূটবুদ্ধি ও প্রবল প্রতিজ্ঞা। বিদ্রোহের আয়োজন করতে নানাসাহেব অনেক প্রদেশ পর্যটন করেছিলেন, এমন কি কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করে নগদ ৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ তাঁর কার্যক্রম ঘুণাক্ষরে টের পায়নি, এমন কি তাদের মনে নানাসাহেব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পর্যন্ত জাগেনি। এমনি সুচতুর ছিলেন এই বিদ্রোহ নায়ক। বিদ্রোহ ঘটবার পূর্বক্ষণে কানপুরের ইংরেজ কলেক্টার ও ব্রিটিশ সেনাপতি নানাসাহেবকেই কানপুর সরকারী তোষাখানার ভার গ্রহণে আহ্বান করেছিলেন। বিদ্রোহের চক্রান্তকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে ফিরে গল্পের আকার ধারণ করেছিল। তার পিছনে ছিল আজিমুল্লার ক্ষুরধার কূটবুদ্ধি।

আজিমুল্লার কাহিনী প্রায় গল্পের মতো। মনে হয় যেন আরব্যোপন্যাসের পাতা থেকে নেমে এসেছেন এই মুসলমান বিদ্রোহী-নায়ক। একজন 'খানসামা' রূপে তার জীবনারম্ভ। সেই সামান্য পদ থেকে আজিমুল্লা নিজ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছিলেন ধীরে ধীরে, অসামান্য প্রতিভায় ও অসাধারণ কৃতিত্বে। খানসামার কাজে থাকতেই তাঁর ইংরেজ মনিবদের কাছ থেকে তিনি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা বলতে শেখেন। কালক্রমে তিনি নানা সাহেবের প্রধান

পরামর্শদাতার পদ অধিকার করেন। বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্টে ডিরেক্টারদের কাছে পেশোয়ার মামলা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নানা সাহেব তাকে ইংলণ্ডে পাঠান। সেখানে 'মে ফেয়ার' ও লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাবৃন্দ তাঁকে সুরসিক ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইংলণ্ডে থেকে তিনি ব্রিটিশের শক্তি ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করার সুযোগ পান। তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যান এবং তাদের যুদ্ধক্ষমতার একটা আঁচ করতে সক্ষম হন। ভারতে ফিরবার পথে তিনি ভারতের বিদ্রোহে তুরস্ক ও আফগানের সহায়তা লাভেরও চেষ্টা করেন।

আজিমুল্লা ছিলেন কূটনীতিবিশারদ। আর ফৈজাবাদের মৌলভি আহাম্মদ শাহ ছিলেন অসাধারণ সংগঠনশক্তির আধার। জ্বালাময়ী ভাষা ছিল তার কণ্ঠে, তা দিয়ে জনগণকে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পারতেন অনায়াসে। অযোধ্যায় বিদ্রোহের যে দ্রুত ও ব্যাপক সাফল্য ঘটেছিল তার কৃতিত্ব অনেকখানি এই আহাম্মদ শাহের। ব্রিটিশেরা তাকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা কয়েদখানা ভেঙ্গে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে, উদ্ধার করে ফাঁসির মঞ্চ থেকে। মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসে তিনি আসন গ্রহণ করলেন জনতার উদ্বেলিত হৃদয়ে। যুদ্ধে ও সংগঠনে তিনি ভয়লেশহীন বিক্রমের পরিচয় দিয়েছেন।

বিদ্রোহ-সেনানায়কদের মধ্যে বীরত্বের অভাব ছিলনা কিন্তু

অভিজ্ঞতা ছিল সামান্যই। ব্রিটিশের বহু ঝানু ও অভিজ্ঞ সেনাপতিদের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়তে হয়েছে। সুতরাং আশ্চর্য নয় যে সম্মুখ যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতিদের কাছে তাঁরা পরাজিত হয়েছেন। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে, বিদ্রোহী সেনাপতিরা—আহাম্মদ শাহ, কুমার সিংহ, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাই—সবাই অসাধারণ শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্ব সব চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে গেরিলা যুদ্ধে। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই দু' বছর তারা অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসাধারণ সাহস ও অভূতপূর্ব দক্ষতায় ব্রিটিশ শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে।

বিদ্রোহের রণনীতি ছিল মূলতঃ অকস্মাৎ আক্রমণ ও অতর্কিত যুদ্ধ। সরকারী তোষাখানা অধিকার, কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া ও চলাচলের উপায় বিধ্বস্ত করা এই নীতিরই অঙ্গ ছিল। প্রায় এগারো বারো হাজার কয়েদী তারা ছেড়ে দিয়েছিল, সরকারী ধন ভাণ্ডার থেকে কোটি কোটি টাকা দখল করেছিল এবং অজস্র রেললাইন ও টেলীগ্রাফের তার কেটে দিয়েছিল। রাণীগঞ্জ ছিল রেলের এক প্রান্ত। বিদ্রোহ সুরু হওয়া মাত্র তা আক্রান্ত হয়; এবং প্রায় দু' হাজার মাইল টেলীগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়। চলাচলের অন্যান্য যে-সব উপায় ছিল সেগুলিকেও যথেষ্ট বিপদ-সঙ্কুল করে তোলা হয়। খাঁ বাহাদুর খাঁ যে ঢালা হুকুম দেন তাতে ছিল: "দুষমনকে সামনা সামনি যুঝতে চেষ্টা কোরোনা। তাদের

ব্যবস্থা ভালো, নিয়মানুবর্তিতা বেশী। তা ছাড়া তাদের বড় বড় কামান আছে। তাদের চলাচলের উপর লক্ষ্য রাখ। নদীর সবগুলি ঘাট পাহারা দাও, যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটাও, রসদ সংগ্রহে বাধা দাও, তাদের ডাক আটকাও, তাবুর আশে পাশে লেগে থাক, তারা যেন না নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায়।"

সে সময়কার ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কী রকম বর্ণে বর্ণে অনুসৃত হয়েছিল এই হুকুমনামা ঃ

"আমরা (ব্রিটিশেরা) শত্রুদের সঙ্গে যখনই যুদ্ধ করেছি তখনই তাদের পরাজিত করেছি, পর্যুদস্ত করেছি। তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ কেড়ে নিয়েছি। কিন্তু তাতে তাদের শেষ নেই। একদল নিঃশেষ হলে আর একদল এসে হাজির হয়। একটি সহর দখল করতে না করতেই আর একটি সহর আমাদের হস্তচ্যুত হয়। ব্রিটিশ সৈন্যের আগমনে যেই একটি জেলা নিরাপদ হয়, অমনি অন্য আর একটি বিপন্ন হয়ে ওঠে। যেই মাত্র দু'টি প্রধান নগরীর মধ্যে যোগাযোগের একটি রাস্তা খোলা হল অমনি সে রাস্তা এমন ভাবে শত্রু নষ্ট করে দেয় যে বছর খানেকের মধ্যে সে পথে মাল চলাচলের কোন উপায় থাকেনা। এক জায়গা থেকে বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে দিলে অন্য জায়গায় তার দ্বিগুণ বা তিনগুণ শক্তি নিয়ে দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের বাধা বিধ্বস্ত করে যেই একদল ব্রিটিশ সৈন্য সম্মুখে অগ্রসর হয় অমনি তাদের পিছনে বিদ্রোহীরা এসে জায়গা দখল করে বসে। আমাদের ক্ষুদ্র সাহসী সৈন্যদল

যে পথ দিয়ে যায় সে পথ ক্ষেতে হলকর্ষণের দাগের মতো দীর্ঘস্থায়ী নয়, সমুদ্রের বুকে জাহাজের আলোড়নের মত ক্ষণস্থায়ী মাত্র।" (এ. ডাফ.)

গেরিলা যুদ্ধের সেরা ওস্তাদ ছিলেন কুমার সিংহ। ত্বরিৎ আক্রমণ ও অস্ত্রসাহসিকতায় এই অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি তার বহুবর্ষের বয়োকনিষ্ঠ সহকর্মীদের চাইতেও বহুগুণ দক্ষ ছিলেন। ডানবারের সৈন্যদলে ক্রমবর্ধমান ক্ষতি এই বৃদ্ধের পরিচালনায় বিহারীদের গেরিলা যুদ্ধের জলন্ত নিদর্শন। তার নিজ রাজত্ব জগদীশপুরকে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ অধিকার মুক্ত করে পুনরায় নিজ পতাকা উড্ডীন করেন। সেই পতাকার নীচে তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রণক্ষেত্রে মুক্ত তরবারী হস্তে তার মৃত্যু বিদ্রোহীনায়কের যোগ্য পরিণাম, স্বাধীনতা সংগ্রামের উপযুক্ত পুরস্কার।

বিদ্রোহীদলের সামরিক প্রতিভা ছিলেন তাঁতিয়া টোপী (১৮১৯—১৮৫৯)। নানাসাহেবের তিনি আশৈশব সুহৃদ এবং আজীবন সঙ্গী। জাতিতে তিনি মারাঠা, স্বাধীনতার শেষ ধ্বজাধারক শিবাজীর ঐতিহ্য ছিল তাঁর রক্তে। মহারাষ্ট্রের শৌর্য ও চাতুর্যের ধারা ছিল তার ধমনীতে। তাঁর বুদ্ধি ও ক্ষমতা বিদ্রোহীদের রক্ষাকবচের মতো। বহুবার বহু বিপদের মধ্যে থেকে তারা নিরাপদে রক্ষা পেয়েছে শুধু তাঁতিয়া টোপীর বুদ্ধির প্রসাদে। যখন সমস্তই শেষ বলে মনে হয়েছিল তখন একমাত্র তাঁর অদ্ভুত সাহসিকতার ফলেই বিদ্রোহীরা গোয়ালিয়র রাজ্য

দখল করতে পেরেছিল। গোয়ালিয়রের ধনভাণ্ডার, ত.র সেনাবাহিনী ও তার ঐতিহাসিক দুর্গ বিদ্রোহীদের অধিকারে এসেছিল। বিদ্রোহনায়কদের মধ্যে একমাত্র তিনিই নর্মদা অতিক্রম করে দক্ষিণে বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ বাহিনী ক্রমাগত নয় মাস ধরে ৩০০০ মাইল তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। ব্রিটিশ বাহিনীর অতি প্রবীন সেনাপতিরাও তাঁকে এঁটে উঠতে পারেননি। দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তার মৃত্যু ঘটে অতি সাধারণ দুষ্কৃতকারী অপরাধীর মতো। কিন্তু সে মৃত্যুকে শহীদের মৃত্যু বলে গণ্য করবে সবাই। ডান্টনের মতো তিনিও একথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন—"দেশের লোককে দেখিও আমার খণ্ডিত শির। সংসারে এমন শির বেশী নেই।"

সবচেয়ে বেশী প্রেরণা দিয়েছেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই। জাতির স্মৃতিতে মূর্তিমতী অগ্নিশিখার ন্যায় তার দীপ্তি অম্লান। অসামান্যা রূপসী ও অসাধারণ সাহসিকা এই নারীর বয়স ছিল অল্প কিন্তু বুদ্ধি ছিল প্রখর। বিদ্রোহ সুরু হতেই তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। বর্ম ছেড়ে নিলেন কৃপাণ।

পুরুষের বেশে পুরুষোচিত বীর্যে অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করতে করতে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন তিনি। হাতে ছিল তার উন্মুক্ত তরবারী, যে তরবারী তিনি বিদেশী শত্রুর বুকে বসিয়ে দিয়েছেন বিনা দ্বিধায়। মাথা নত করার রীতি জানা ছিল না তাঁর, জানা ছিলনা ভয়। তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্য ঝাঁসি যখন

ইংরেজেরা জোর করে কেড়ে নিয়েছিল তিনি বলেছিলেন "মেরা ঝাঁসি দেউঙ্গী নেহি।" আমার ঝাঁসি দেবনা কিছুতেই। সেই প্রতিজ্ঞায় তিনি আপন মৃত্যুর সাক্ষর রাখলেন অবিচলিত মহিমায়। ঝাঁসির পতনের পর ঝাঁসি থেকে কল্পি—এই ১০২ মাইল পথ তিনি অশ্বপৃষ্ঠে চব্বিশ ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিলেন। পিছনে অনুধাবনরত জয়দৃপ্ত ব্রিটিশ সেনাদল, সম্মুখে বিপদসঙ্কুল সুদীর্ঘ পথ। অমিতবিক্রমে শত্রুকে বাঁধা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পার হলেন লক্ষ্মীবাই। ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে এক ভারতীয় নারীর অভূতপূর্ব বীরত্ব কাহিনী, অশ্রুতপূর্ব স্থৈর্য, সাহস ও অশ্বারোহণ দক্ষতা। সিংহাসনে বসেই হোক আর যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠেই হোক তিনি ছিলেন সর্বজনপূজ্যা। তাঁর প্রতি জনগণের আনুগত্য ছিল অবিচলিত। তার উপস্থিতি তাদের হৃদয়ে দিয়েছে আশা, বাহুতে দিয়েছে শক্তি। তিনি ছিলেন বিদ্রোহের মূর্তিমতী প্রতীক, তার প্রেরণা, তার স্তম্ভ। তাঁর নাম আজ কাহিনীতে পরিণত। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে ইতিহাস, লেখা হয়েছে গান। তাঁর নাম ভারতের স্বাধীনতার যজ্ঞশালায় নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো যুগ যুগ ধরে জ্বলছে অনির্বান তেজে।

এদের সঙ্গে বিদ্রোহের অন্যান্য বহু বীর প্রাণদান করেছে যুদ্ধে। তাদের নাম জানা নেই কারো, নেই কোন ইতিহাস। কিন্তু জগতে দাসত্বের পরিবর্তে যারা মৃত্যুকে বরণ করে এসেছে সর্বদেশে এবং সর্বকালে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত অজ্ঞাত ও অখ্যাত এই সহস্র বীর সন্তানেরা। তাদের সমাধিতে না আছে কোন স্মৃতিফলক, না আছে কোন গৌরবচিহ্ন। সেখানে কেউ দেয়না ফুল, কেউ জ্বালেনা আলো। শাসকেরা চেষ্টা করেছেন তাদের স্মৃতিকে চিত্রিত করতে কলঙ্কিত তুলিকায়। কিন্তু দেশের জনগণের হৃদয়ে তাঁদের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল চিরকালের জন্য। সেখানে তাদের আসন পাতা আছে সম্মানের, সম্বর্ধনার। কোনো অপপ্রচার, কোনো মিথ্যা রটনা সেখান থেকে তাদের বিচ্যুত করতে পারবে না কোনো দিন। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দেশের মুক্তিকামী নরনারী তাদের স্মরণ করবে অসীম শ্রদ্ধায়, ও পরম বিস্ময়ে।

ছয়

ত্রাস

বিরাট বিপ্লব যখন ঘটে তখন প্রাণহানি, অত্যাচার, দুঃখ-ক্লেশ এক প্রকার অনিবার্য। তা এড়াবার উপায় নেই। সিপাহী বিদ্রোহ সাড়া ভারতবর্ষকে নাড়া দিয়েছে ভূমিকম্পের মতো। উভয় পক্ষই বহু হত্যা ও অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। সেই বেদনাদায়ক ও তিক্ত কাহিনীর উপরে বিস্মৃতির পর্দা টেনে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বিদ্রোহের বর্ণনায় কেবল একাধারে সিপাহীদের অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে ও সালঙ্কারে বর্ণনা করেছেন, নিজেদের কৃতকর্ম বেমালুম চেপে গিয়েছেন। বিদ্রোহের ফলে দুই পক্ষে যে সংঘর্ষ ঘটেছে তাতে কারো হাতই অকলঙ্ক নয়, কোন পক্ষেরই অত্যাচারের রেকর্ড গর্বিত হওয়ার মতো নয়। কিন্তু ইংরেজ বর্ণিত কাহিনীগুলিতে ভারতীয়দের দুষ্কৃতি নিয়ে এত কোলাহল করা হয়েছে যে, স্বভাবতঃই আমাদের মনে একবার ওদিককার কীর্তিটা জনসমাজে উদ্‌ঘাটিত করে দেখাবার ইচ্ছা জাগে।

বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি যে-দিন অগ্নি উদ্‌গীরণ করল, তার গলিত লাভায় আশে পাশে যা কিছু ছিল সব পুড়ে ধ্বংস হলো। ব্রিটিশেরা সেই সব ধ্বংসের চিহ্ন সযত্নে রক্ষা

করে জগতের কাছে একটি বৃহৎ জাতিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু জাতির মনের অবচেতন কোঠায় তার স্মৃতি রয়েছে জেগে, দিনে দিনে পলে পলে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে আমাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। তাই নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই আমরা বিদ্রোহে ব্রিটিশ পক্ষের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নৃশংসতার চিত্রের উপর ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য হলেম।

ভারতীয়েরাই প্রথমে মারণ-লীলা সুরু করেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইংরেজকে হত্যা করা বিদ্রোহের পরিকল্পনারই অন্যতম অঙ্গ। দিল্লী প্রভৃতি অনেক স্থানে ব্রিটিশ হত্যা দ্বারাই বিদ্রোহের সুরু হয়। ক্ষেতে ধান কাটার সময় কাস্তের ফলায় যেমন ধানের গুচ্ছ, বিদ্রোহীদের তরবারীতে তেমনি নিহত হয়েছে ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক লোকেরা।

কিন্তু কেন তারা তা করল? নারী ও শিশুহত্যার কোন যুক্তি নেই, কোন ক্ষমা নেই। আমাদের ইতিহাসে তা এক কলঙ্কিত অধ্যায়। কিন্তু ইংরেজ পুরুষদের হত্যা করার কারণ বোধহয় এই যে তাদের বন্দী করে রাখা সহজ বা নিরাপদ ছিলনা। দেশের সীমান্তের বাইরে জীবন্ত তাড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব ছিল না। একটা জেলা থেকে তাদের অন্য জেলায় তাড়িয়ে দেওয়ার মানে সে-জেলায় তাদের জনবল বৃদ্ধি করা। তাছাড়া ইংরেজ অফিসারদের মৃতদেহ দেখে জনসাধারণের মনে ইংরেজের ক্ষমতাহানির সম্পর্কে বিশ্বাস

দৃঢ়মূল হয়েছে। 'চোখে না দেখলে বিশ্বাস নেই' একথা বিপ্লব বা বিদ্রোহের বেলায় যতটা খাটে এমন আর কখনও নয়।

কিন্তু ভারতীয়েরাই প্রথমে মারণ-যজ্ঞ স্বুরু করলেও ব্রিটিশের প্রতিশোধ গ্রহণ, তার অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড, তার নৃশংসতা সমস্ত সীমা ডিঙ্গিয়ে গিয়েছে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিদ্রোহীরা ঝাঁসিতে ৫৫ জন ইংরেজের জীবন নাশ করেছিল, তার প্রতিশোধ হিসাবে ইংরেজ ঝাঁসিতে ৫০০০ ভারতীয় হত্যা করল। প্রতি একজন ইংরেজের জীবনের শোধ ব্রিটিশ নিয়েছে একশ' ভারতীয়ের প্রাণ নাশ করে। ঝাঁসি নগরী দখল করে ইংরেজ এক সপ্তাহকাল ধরে লুণ্ঠন চালিয়েছে। ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক ঝাঁসির লুণ্ঠন ও নরহত্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আছে বিষ্ণু গোডসে ভারসাইকার লিখিত "মাজা প্রভাস" গ্রন্থে। দিল্লীতে জনকয়েক ব্রিটিশ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল ২৬,০০০ ভারতীয়কে গুলির আঘাতে, ফাঁসি দিয়ে বা কামানের মুখে হত্যা করে। সহরে গ্রামে সর্বত্র এই হত্যা লীলার তাণ্ডব চলেছে বেপরোয়া ভাবে, দিনের পর দিন।

অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডরিক কুপারের নৃশংসতা কিছুতে ভুলবার নয়। লাহোরে অবস্থিত সিপাহীরা বিদ্রোহ করে দু'জন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে। সিপাহীদের উপরে তার যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল তার বর্ণনা কুপারের নিজ ভাষায়ই করা ভালো ঃ

"১৫০ জনকে হত্যা করার পর ঘাতকদের মধ্যে এক .ন মূৰ্ছিত হয়ে পড়ল। তাকে খানিকটা বিশ্রাম কর... দিলাম। তারপর আবার নিধন-পর্ব সুরু হলো। নিহতের সংখ্যা যখন ২৩৬ এ দাঁড়িয়েছে তখন জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে খবর দেওয়া হলো। সে খবর শুনে কয়েদখানায় আর যে-সব বন্দীদের প্রাণদণ্ড দেওয়ার অপেক্ষায় আটক রাখা হয়েছিল তারা আর সেখান থেকে বাইরে আসতে চায়না। দরজা খুলে দেখা গেল, অজ্ঞাতভাবে হলওয়েলের অন্ধকূপ হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে। ৫৪টি মৃতদেহ কুঠরীর ভিতর থেকে টেনে বাইরে আনা হলো। লোকগুলি ভয়ে, ক্লান্তিতে, পরিশ্রমে গরমে ও আংশিক শ্বাসকষ্টে আপনা হতেই মরে গেছে।" (এফ, কুপার লিখিত "দি ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব")। একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে যে একমাত্র হলওয়েলের মিথ্যা প্রচার ছাড়া জগতে অন্ধকূপের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। কিন্তু তার নৃশংসতার সাক্ষ্য রয়েছে কুপারের নিজ জবানীতেই।

ক্ষুদ্র বালকদের হত্যা করা হয়েছে বিনাদ্বিধায়। তাদের অপরাধ তাদের হাতে বিদ্রোহীদের পতাকা দেখা গেছে! একদল ব্রিটিশ সৈন্য কুঁচ কাওয়াজ করে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। পথের পাশে জন বারো লোক তাদের দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই অপরাধে অমনি তাদের নিকটবর্তী গাছের ডালে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হলো। কর্ণেল নীলের সৈন্যগণ যে কয়টি ভারতীয়কে ধরতে

PICTURE POST

ব্রিটিশের প্রতিশোধ ;—লুণ্ঠনে। বিদ্রোহ দমনের কালে ব্রিটিশ অগণিত ভারতীয়ের ধনসম্পত্তি লুট করেছে পিস্তলের ডগায়।

পেয়েছে তাদের প্রত্যেককেই গুলি করে মারা হয়েছে। শুধু এলাহাবাদেই ব্রিটিশ হত্যা করেছে ৬০০০ হাজার লোক। রেঁনোর সৈন্যদল যে পথ দিয়ে গেছে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সে-পথের আশেপাশের গ্রামে একমাত্র ধ্বংস স্তুপ ছাড়া আর কিছুই রেখে যায়নি।

মৃত্যুর নিষ্ঠুর হস্তাবলেপনে দেশের জীবন নিঃশেষে মুছে গেছে বহু স্থান থেকে। শারীরিক অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানসিক পীড়ন। অনেক ক্ষেত্রে সেটাই অধিকতর নিষ্ঠুর হয়েছে। মুসলমানদের শুকরের চামড়া দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে সেলাই করা হতো, তারপর ফেলে দেওয়া হতো নদীতে। কিম্বা শুকরের চর্বিতে ভিজিয়ে তাদের ফাঁসি দেওয়া হতো এবং মৃতদেহ আগুনে দগ্ধ করা হতো। হিন্দুদের ফাঁসি দেওয়ার আগে গোমাংস মুখে পুরে দেওয়া হতো। ফতেগড়ের দেওয়ানকে হত্যা করার আগে তাঁর মুখে জোর করে গোমাংস পুরে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সামাজিক মর্যাদা যাই কেন হোকনা, তাদের দিয়ে মেথরের কাজ পর্যন্ত করান হয়েছে। দৈহিক আঘাতের ক্ষত শুকিয়ে যেতে সময় লাগে না। মনের আঘাত থাকে তাজা, সে ক্ষত দূর করা সহজ নয়।

দিল্লীর বিখ্যাত উর্দু কবি গালিবের একটি রচনায় এই নৃশংসতার ফলে যে ত্রাস, হতাশা ও ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল তার একটি যথাযথ চিত্র আছে ঃ—

কোই উম্মীদ বাড় নাহি আতি
কোই সুরৎ নজর নাহি আতি
মৌত কা এক দিন মোয়াঐন হ্যায়
নিদ কিউঁ রাত ভর নাহি আতি।

তাৎপর্য:

কোন খাদে নেই আশার লেশ,
কোন খাদে নেই সুন্দরের আভাস,
মরণের দিন স্থির হয়েছে,—
সারারাত কেন চোখে কারো নামেনি ঘুম?

ব্রিটিশেরা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কেন? কেন এই নৃশংসতা? বোধহয় যুদ্ধের ফলেই এ অত্যাচার ও নৃশংসতার মনোবৃত্তি জেগে উঠেছিল। তার উপরে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। কিন্তু আসল কারণ হলো, শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণের বিদ্রোহ করার স্পর্দ্ধা ইংরেজ সইতে পারছিল না। কী সাহস! তেলেপোকা বাজপাখীকে কামড়াবে? তেলে পোকাকে তবে আচ্ছা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন! স্যার হেনরী লরেন্স বললেন, "শাসক শ্রেণীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম যে ভাবেই হোক বজায় রাখা চাই।" তাই এই ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণ। রাইস হোমস অকপট ভাষায় স্বীকার করেছেন, "এই প্রতিশোধ যতটা স্বজাতিদের শারীরিক কষ্ট ও প্রাণহানির জন্য না হোক তার চেয়ে বেশীটা হলো একটি নিম্নস্তরের জাতি তাদের চাইতে উচ্চতর জাতিকে যে অবমাননা
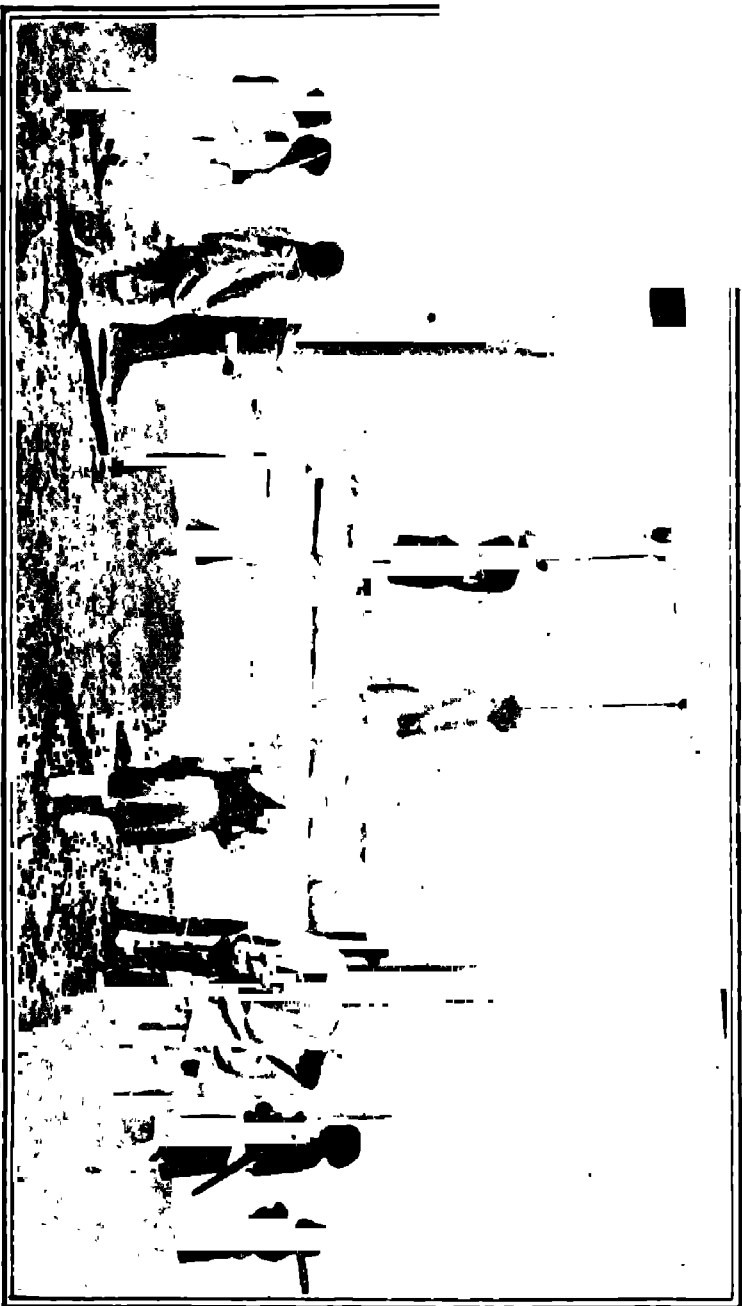
PICTURE POST

ব্রিটিশের প্রতিশোধ ;—হত্যায়। বিদ্রোহ দমনের পর শত শত ভারতীয়কে ব্রিটিশ ফাঁসি দিয়েছে প্রকাশ্যে।

করেছিল ভারতের জন্য।" এই অবমাননা-বোধ ব্রিটিশকে প্রতিহিংসার জন্য ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। হতভাগা কালা নিগারগুলিকে ভালো হাতে একবার শিক্ষা দেওয়া দরকার। সে সময়ে ব্রিটিশের এই মনোবৃত্তির পরিচয় ছিল একটি চলতি কথায়—হাঁস, বনের মোরগ ও পাণ্ডিয়া এক সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। পাণ্ডিয়া গুলি করাতেই সব চেয়ে বেশী আনন্দ। পাণ্ডিয়া মানে বিদ্রোহে লিপ্ত সিপাহী, মৌগল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী বিদ্রোহে প্রথম গুলি ছুড়েছিল বলে এই পাণ্ডিয়া নামের উৎপত্তি।

ব্রিটিশের কুকীর্তি আমাদের অন্যায় আচরণকে ম্লান করে দিয়েছে, অথচ তাদের মিথ্যা প্রচার কার্য আমাদের অপরাধকেই জোর তুলিতে অঙ্কিত করেছে, তাদের নিজেদের অপকার্য আছে চাপা। কিন্তু এই অন্যায় আমাদের মনের তলায় আজও গুমরে মরছে। মানুষের অবস্থা বদলায়, সে হাসে, কাজ কর্ম করে, কিন্তু ব্যথা তো নিঃশেষে দূর হয়না। সে বেঁচে থাকে দীর্ঘ দিন।

সাত

ব্যর্থতার কারণ

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ একাধিক। মোটামুটি সেগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে পড়বে সে সমস্ত কারণ, ঘটনা ও ব্যবস্থা যার উপরে বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের কোন হাত ছিল না। কতগুলি ব্যাপার তাঁদের চিন্তার বাইরে ছিল, কতগুলি বা এমন ছিল যার পরিবর্তন সাধন বিদ্রোহীদের সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় ভাগে আছে যে সব দুর্বলতা সেগুলিকে অনেকাংশে বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত বলেই গণ্য করা যেতে পারে। বিদ্রোহীরা যে-নীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ, যে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং যে সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল, তারই মধ্যে ছিল তাদের ব্যর্থতার বীজ।

ব্রিটিশের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, ১৮৫৭ সালটি তাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। ক্রিমিয়ার ও চীন যুদ্ধের সবে মাত্র শেষ হয়েছে। এই দুই যুদ্ধের বিজয়দৃপ্ত সৈন্যেরা বিদ্রোহে সিপাহীদের বিরুদ্ধে লড়েছে এবং জয়লাভ করেছে। বছরের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার পারস্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে এবং প্রতিবেশী আফগান সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক এক নতুন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। বোলান এবং খাইবার গিরিপথে বহিরাক্রমণের ফলে ব্রিটিশের যে শক্তিক্ষয় ঘটতে পারতো এতে সে সম্ভাবনা দূর হয়। বিদ্রোহের উদ্যোক্তারা এসব

কারণে একেবারে সম্পূর্ণরূপে একাই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য হয়েছে, কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য পায়নি।

জলপথের সুযোগ

সমুদ্র পথে ব্রিটিশের আধিপত্য অব্যাহত থাকায় তাদের একটা মস্ত লাভ হয়েছে। জলপথে সৈন্য ও সমর-সম্ভার আমদানীর সুযোগ তাদের জয়লাভের একটা প্রধান কারণ। বিশাল ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে বিদ্রোহীদের জয়লাভের ফল স্থায়ী বা গুরুত্বপূর্ণ হয়নি, জলপথে নূতন সেনাদল আমদানী করে সে জয়লাভকে অল্পকালের মধ্যেই পুনরায় বিপর্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে। হার্বার্ট এডওয়ার্ডস বিদ্রোহের গোড়াতেই এই সুবিধার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি লিখলেন, "সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরগুলি আর পাঞ্জাব দখলে রাখতে চেষ্টা কর। মধ্য ভারতে আমরা হারি তো ক্ষতি নেই। বড় বড় বন্দর গুলি হাতে থাকলে সৈন্য আমদানী করে হাতছাড়া রাজ্য আবার অধিকার করতে পারবো। বন্দর আর পাঞ্জাব যে-ক'রেই হোক আমাদের দখলে রাখা চাই।" সমুদ্রপথে জাহাজ বোঝাই ব্রিটিশ সৈন্য দলে দলে এসে বিদ্রোহ দমনে অস্ত্রধারণ করছে দেখে জনসাধারণের মুখে চলতি প্রবাদের সৃষ্টি হলো—"হায়রে, সাগর জননী তার নিজের ছেলেদের সর্বনাশ করতে নিজেই সাদা দুষমন প্রসব করছেন!"

ইংলণ্ড থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রায় অর্ধেক পাঠানো

হয়েছিল ভারতের বিদ্রোহ দমনে। ১ লক্ষ ১২ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য এসেছিল ইংলণ্ড থেকে। ভারতবর্ষেও ৩ লক্ষ ১০ হাজার নতুন সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ বাহিনীর ছিল আধুনিক ও উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র। 'এনফিল্ড গান' তখন সবে মাত্র তৈরী হয়েছে। যুদ্ধে এই অস্ত্রের ব্যবহারকে সে-যুগে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। সিপাহীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য এই এনফিল্ড গান ব্যবহার করার সুবিধা পেয়েছে। বিদ্রোহীরা কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করার বিস্ময়কর প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা সত্বেও প্রতিপক্ষের তুলনায় তাদের হাতিয়ার ছিল সংখ্যায় সামান্য এবং আধুনিকতায় পশ্চাদবর্তী। ডব্লিউ, এচ, রাসেল বিশেষ অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ইংরেজ সৈন্যেরা যুদ্ধে আহত হয়েছে শুধু সাধারণ তরবারির আঘাতে।

অযোধ্যায় বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ যে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছিল তার তালিকা দেখলেই বোঝা যায় বিদ্রোহীদের যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের কী দারুণ অভাব ছিল। ৬৮৪ টি ছোট কামান, ১৮৬,১৭৭ টি বন্দুক, ৫৬১,৩২১ তরবারি, ৫০,৩১১ বর্শা ও ৬,৩৮,৬৮৩ অন্যান্য ছোট খাটো অস্ত্র সেখানকার বিদ্রোহীদের সম্বল। এনফিল্ড রাইফেলের বিরুদ্ধে তরওয়াল নিয়ে লড়তে যাওয়ার সহজ অর্থ হলো একেবারে জেনে শুনে আত্মহত্যা করা। নানা সাহেব খেদ করেছিলেন, "এনফিল্ড রাইফেলের গুলি বন্দুকের নল থেকে বেরোবার আগেই মানুষ সাবাড় করে দেয়।"

বিদ্রোহীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব পূর্ণ করতে চেয়েছে জন-বল দিয়ে। কিন্তু গায়ের জোর দিয়ে তো অস্ত্রের জোর ঠেকানো যায়নি। চার্লস বল্ লিখেছিলেন—"বাংলার বিদ্রোহী সৈন্যদের হাতে যদি মাইন রাইফেল থাকতো, তবে দিল্লীতে মোগল রাজত্বের অবসান ঘটতোনা। তৈমুরলঙের বংশধর হতভাগ্য বাহাদুর শাহ তাহলে তার পিতা ও পিতামহের মণিমুক্তা খচিত সিংহাসনে বসে রাজদণ্ড পরিচালনা করতে পারতেন, অন্ধকার কারাকক্ষে একটা অর্ধভগ্ন কাঠের 'চারপায়াতে' তাঁকে রাত্রি যাপন করতে হোত না।"

এনফিল্ড রাইফেল ছাড়া আরো আধুনিক সাজসরঞ্জামের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল বিদ্রোহীদের। টেলীগ্রাফ ইংরেজের পক্ষে কম কাজে আসেনি। সংবাদ আদান প্রদানের এই নব উদ্ভাবন-যন্ত্র ভারতবর্ষে তখন সবে মাত্র আমদানী হয়েছে। বিদ্রোহ দমনে এর উপযোগিতা ছিল অসাধারণ। লণ্ডন টাইমসের সংবাদদাতা লিখেছিলেন,"বৈদ্যুতিক টেলীগ্রাফ যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারের কাল থেকে এপর্যন্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয়েছে ভারতবর্ষের বিদ্রোহ দমনে। টেলীগ্রাফ না থাকলে ব্রিটিশ সেনাপতির অর্ধেক সৈন্যের শক্তি কমে যেত।" বারাকপুরে বিদ্রোহীরা যে সবার আগে সদ্য স্থাপিত টেলীগ্রাফ আফিসটি পুড়িয়ে দিয়েছিল তা অকারণে নয়। বিদ্রোহ আরও আগে দেখা দিলে সাফল্যের আশা ছিল। বিদ্রোহ যখন ঘটল তখন আধুনিক বিজ্ঞান তার বিপক্ষে নিয়োজিত হতে পেরেছে বলেই সে ব্যর্থ হয়েছে।

এই সব প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল একমাত্র হঠাৎ আক্রমণের দ্বারা। প্রথম আক্রমণের যে-সকল সুবিধা থাকে, সে সুবিধা বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পায়নি। কারণ দেশের সর্বত্র একই দিনে বিদ্রোহ ঘটাতে পারলেই তা পাওয়া যেত। বিদ্রোহীরা অস্ত্রশস্ত্রে যতই কম শক্তিশালী হোকনা কেন, একদিনে একই সঙ্গে আসমুদ্র-হিমাচল বিদ্রোহের সংঘটন ঘটাতে পারলে ঐ সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা জয়লাভ করতে পারতো। অনেক কেন্দ্রে বিদ্রোহ পরে ঘটেছে বটে, কিন্তু প্রথমে ঘটেনি। সর্বত্র একসঙ্গে বিদ্রোহের যে আকস্মিকতা থাকে তার সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহীরা প্রতিপক্ষকে বিদ্যুৎগতিতে বিধ্বস্ত করতে পারেনি। সেই হয়েছে তাদের দুর্বলতা, সেই হয়েছে তাদের কাল।

বিদ্রোহীদের পরিকল্পনানুযায়ী সর্বব্যাপী এক বিদ্রোহের দিন ধার্য হয়েছিল ২২ শে জুন। এই তারিখটির একটি তাৎপর্য আছে। ঐ দিনেই পলাশীর রণক্ষেত্রে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়মূল হয়। সুতরাং ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের আয়োজনে ঐ তারিখটির গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও বিভিন্ন কেন্দ্রের বিদ্রোহীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে এই বৃহৎ ভূখণ্ডের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তব্যাপী একটি অখণ্ড বিদ্রোহ একই দিনে ও একই সঙ্গে ঘটানো সম্ভব হয়নি। সমস্ত পরিকল্পনা পাকা হওয়ার আগেই ১০ই জুন তারিখে মীরাটে সিপাহীরা

বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো। নির্দিষ্ট সময়ের আগে এই বিদ্রোহ ঘোষণার ফলে নেতৃবর্গ যে প্ল্যান ঠিক করে রেখেছিলেন তা গোলমাল হয়ে গেল। খুব ব্যাপক ভাবে বিদ্রোহ ঘটলে এ প্রাথমিক ত্রুটির কিছুটা সংশোধন হতে পারতো। তা'ও হলোনা। ঠিক সময়ের আগে আঘাত হানলে শত্রুরই সুবিধা হয়, এই তিক্ত তথ্য বিদ্রোহীরা উপলব্ধি করলেন। একমাত্র বিদ্রোহের প্রসার বহু-বিস্তৃত করতে পারলেই বিদ্রোহীদের কিছুটা আশা ছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও একথা ভালো করেই জানতেন। ক্যানিং বলে রেখেছিলেন, "সিন্ধি যদি বিদ্রোহে যোগ দেয়, তবে কালই আমাকে পাততাড়ি গুটোতে হবে।" কিন্তু সিন্ধিয়া বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। শুধু সিন্ধিয়া নয়, সমস্ত দেশীয় নৃপতিরাই ব্রিটিশের পাশে এসে দাঁড়াল।

দেশীয় নৃপতিরা ব্রিটিশের বিপক্ষে যায়নি কেন এ প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক। না যাওয়ার কারণ দুটি। প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩৪ সাল থেকে এই নিয়ম করেছিলেন যে তাদের অনুমোদন ছাড়া কোন দেশীয় রাজ্যে কেউ গদিতে বসতে পারবে না। রাজ্যের শাসনকর্তার মৃত্যুর পরে যাতে এমন কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হন যিনি ইংরেজের প্রতি মমত্বশীল ও তার দরদী বন্ধু। সন্ধির সর্তগুলি বাতিল করতে চাইবে এমন কোন লোক রাজা হলে অসুবিধা ঘটবে ভেবেই কোম্পানী নৃপতিদের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে অনুমোদনের

সর্তটি রেখেছিলেন (কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, চতুর্থখণ্ড, পৃঃ ৪৯১)। প্রায়ই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঠিক করে দিতেন কোন্ দেশীয় রাজ্যে কে দেওয়ান হবে। বরোদা রাজ্যে তো ব্রিটিশের সঙ্গে মহারাজার যে সন্ধি ছিল তাতেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে ব্রিটিশকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। বিদ্রোহের সময়ে দুটি প্রধান দেশীয় রাজ্য, হায়দ্রাবাদ ও গোয়ালিয়রের প্রধান মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রিটিশের অনুগৃহীত ব্যক্তি—সালোয়ার জঙ্গ ও দিনকর রাও। তাঁরা দুজনে তাদের প্রভু নিজাম ও মহারাজকে হাতের মুঠার মধ্যে রেখেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলতে দেননি। অনেক দেশীয় রাজারা গদিতে উঠেছিলেন ব্রিটিশের সহায়তায়, গদিতে বসেছিলেন তাঁদের আনুকূল্যে। বিদ্রোহ সাফল্যলাভ করলে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হতো। ব্রিটিশের সৈন্য সামন্ত, গোলাবারুদ সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের দূরে ঠেকিয়ে রাখছিল। সুতরাং ব্রিটিশের পক্ষে থাকাই ছিল ঐ রাজাদের স্বার্থ। ঠিক এই যুক্তি দিয়েই সিন্ধিয়াকে তার রাজ্যের রেসিডেণ্ট বিদ্রোহীদের দলে যোগদান থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন যদিও সিন্ধিয়ার সভাসদ ও সেনাপতিরা সবাই বিদ্রোহের পক্ষে ছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজন্যবর্গের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল দত্তকগ্রহণের অধিকার সম্পর্কে। ব্রিটিশ সরকার পুত্রহীন নৃপতিদের পোষ্যপুত্র গ্রহণে আপত্তি করতেন। কাজেই নৃপতিরা আশঙ্কা করতো যে উত্তরাধিকারী না থাকলে রাজত্ব আর তাঁদের বংশে থাকবেনা। লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহের অব্যবহিত

পূর্বে দেশীয় রাজাদের গোপনে এই আশ্বাস দিলেন যে অতঃপর দত্তকগ্রহণের অধিকারে গভর্ণমেণ্ট আর হস্তক্ষেপ করবেন না। এই রাজনৈতিক চালবাজি দিয়ে ক্যানিং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করলেন। সমুদয় দেশীয় নৃপতিরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থক ও রক্ষক হয়ে দাঁড়ালো।

কায়েমী স্বার্থের অন্তরায়

বিদ্রোহীরা দ্বিতীয় বাধা পেয়েছে কায়েমী স্বার্থের সমর্থকদের কাছ থেকে। বিদ্রোহের নেতৃত্বে যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সমাবেশ হয়েছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। তার ফলে বিদ্রোহের পরিচালনা ও গতি সুসম্বদ্ধ হতে পারেনি। তাছাড়া কায়েমী স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই বিদ্রোহের অরাজকতার সুযোগ নিয়েছে। এরা ছিল ব্রিটিশের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সে সময়ে ভারতবর্ষের মোট রাজস্বের সঙ্গে বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের আয়ের তুলনা করলেই এ সম্পর্কে একটা আঁচ পাওয়া যাবে।

দেশীয় রাজ্য	১৩,০০০,০০০	পাউণ্ড
খাজনাহীন জমি জমা	৫,০০০,০০০	”
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ সরকারের ক্ষতি	২,০০০,০০০	”
রাজনৈতিক কারণে ভাতা দান	২,৫০০,০০০	”
	২২,৫০০,০০০	
রাজস্বের পরিমাণ ছিল মোট	৪৭,৮০০,০০০	

অর্থাৎ রাজস্বের প্রায় অর্ধেকটা যেতো কায়েমী স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গহ্বরে। আশ্চর্য নয় যে তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ী করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশে কর্ষণ-যোগ্য জমির পরিমাণ বেড়েছিল ৩ কোটি থেকে ৭ কোটি একরে। অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিরাজস্ব হিসেবে গভর্ণ-মেণ্টের আয় বেড়েছিল মাত্র ৬০,০০০ পাউণ্ড। এই ৬৪ বছরে জমিদারদের আয় বেড়েছিল প্রায় ১৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থনে বলেছিলেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক দিক দিয়েই ত্রুটিপূর্ণ, মৌলিক বিচারেও এর অনেক খুঁৎ ধরা পড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু একদিক দিয়ে এর একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ফলে আমরা এদেশে একদল ভূস্বামী সৃষ্টি করেছি যাদের ক্ষমতা অনেক, জনসাধারণের উপর প্রতিপত্তি গভীর এবং ব্রিটিশ শাসনের স্থায়ীত্বই যাদের কাম্য। যদি কোনদিন এদেশে গণবিদ্রোহ বা বিপ্লব দেখা দেয় তবে এই ভূস্বামীরা হবে ব্রিটিশ রাজত্বের সমর্থক ও স্তম্ভ"। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময় বেণ্টিঙ্কের এই প্রত্যাশা কী নির্মম রূপে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ থেকে। এই পত্রটি ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমানের মহারাজা মেহতাবচন্দ্রের অধিনায়কত্বে বাংলার জমিদারেরা লিখেছিলেন বড়লাটের কাছে। পত্রে লেখা ছিল ঃ

"বাংলার যুবা বৃদ্ধ, শিশু সবাই ব্রিটিশ শাসকদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজকে এমনভাবে জড়িয়েছে যে, যে-সকল এলাকায় উন্মার্গগামী বিদ্রোহীরা সুবিধা পেয়েছে সে-সকল স্থানেই তারা তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে।"

এই কায়েমী স্বার্থ ব্রিটিশকে যে সমর্থন ও সাহায্য দিয়েছে, তা প্রতিরোধ করবার একমাত্র উপায় ছিল দেশের কিষাণদের জমিদার ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ানো। সে-দিকে মোটেই চেষ্টা হয়নি। কারণ বিদ্রোহের নেতৃত্বই ছিল সামন্ততান্ত্রিক। তারা বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য জনগণের কাছে যে আবেদন জানিয়েছেন, তার মধ্যে কিষাণদের কোন উল্লেখ ছিল না। ইস্তাহারে আর সব শ্রেণীর লোকদেরই আহ্বান করা হয়েছে, ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদে কে কী সুবিধা লাভ করবে সব কিছুরই উল্লেখ ছিল। ছিলনা শুধু চাষীদের কথা, যারা লাঙল নিয়ে মাটির বুক চিড়ে ফলায় ফসল, যোগায় অন্ন, আনে সমৃদ্ধি। তারা ছিল সকলের অবজ্ঞাত। বরং বিদ্রোহ সফল হলেই তাদের বোধ হয় অধিকতর শোষিত ও উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিষাণদের সহযোগিতা লাভ করতে না-পারাটাই বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

বিদ্রোহের মূল দুর্বলতা

অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড, দোয়াব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অবশ্য বিদ্রোহে সিপাহীদের যোগ দেওয়া মানেই হলো

জনসাধারণের সমর্থন। ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল রোহিলাখণ্ডের মুসলমান আর পদাতিক বাহিনীর অধিকাংশ অযোধ্যা ও দোয়াবের হিন্দু। তারা কিষাণশ্রেণীর পর্যায়-ভুক্ত ছিল এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। অযোধ্যাকে জোর করে ব্রিটিশ শাসনান্তর্ভুক্ত করার সময় থেকে বিদ্রোহ পর্যন্ত ঐ প্রদেশের সিপাহীদের মধ্য থেকে প্রায় ৭৫ হাজার দরখাস্ত করা হয়েছে ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার অসুবিধা ও কঠোরতার বিরুদ্ধে। এই সব কারণেই ঐ প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহ গণ-বিপ্লবের আকার ধারণ করেছে।

বোম্বাই ও মাদ্রাজের সিপাহীরা বিদ্রোহের আহ্বানে মোটেই সাড়া দেয়নি। বেঙ্গল আর্মি যেমন মুখ্যতঃ উচ্চবর্ণের লোক নিয়ে গঠিত ছিল মাদ্রাজ ও বোম্বে আর্মি তেমন নয়। সেগুলিতে ছিল নিম্নজাতির লোক। বেঙ্গল আর্মির রেজিমেণ্ট গঠিত হতো এই ভাবে: ৪০০ ব্রাহ্মণ, ২০০ রাজপুত, ২০০ মুসলমান, ২০০ অন্ত্যজ হিন্দু। এর আগে যে বহুসংখ্যক দরখাস্তের উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকেই বোঝা যাবে যে অযোধ্যার বেশীর ভাগ সিপাহী ছিল বর্তমানে আমরা যাকে বলি "কুলাক" শ্রেণীর। বুন্দেলখণ্ড ও বারাণসীর জমিদারদের মধ্যে অনুরূপ ব্রাহ্মণ ও রাজপুত প্রাধান্য ছিল। বিদ্রোহের আবেদন বেশীর ভাগই করা হয়েছে বর্ণহিন্দুদের কাছে। আশ্চর্য নয় যে স্যার হেনরী লরেন্স কূটনীতির সঙ্গে অন্ত্যজ হিন্দুদের বিদ্রোহ দমনে ব্যবহার করেছেন।

অযোধ্যায় 'পাসী' নামক অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক নিয়ে তিনি সৈন্যদল গঠন করেন এবং লর্ড ক্যানিংকে আশ্বাস দেন যে ঐ সৈন্যদের সাহায্যে তিনি অযোধ্যা রক্ষা করতে পারবেন। ১৮৫৭ সালের ১০ই অক্টোবর বিডন উইলিয়ম মুরকে লিখলেন, "আমাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে নীচজাতির লোকের উপরে।"

বিদ্রোহীরা শক্তি আহরণ করেছে বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ, স্বত্ব-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ও জমিজমা বঞ্চিত জমিদারদের মধ্য থেকে। দৃঢ়মূল ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করার উপযোগী শক্তি ছিলনা এই বিদ্রোহের। সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে যদি পরিপূর্ণরূপে যোগ দিত, যেমন কোন কোন বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে দিয়েছিল, তবেই বিদ্রোহ সফল হতে পারত। প্রারম্ভ থেকেই বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের মধ্যে শ্রেণী ও স্বার্থের যে পরস্পর বিরোধী মনোভাব বর্তমান ছিল সেই হলো এই বিদ্রোহের দুর্বলতা, তারই ফলে তার পরিণতি সাফল্যযুক্ত হতে পারেনি।
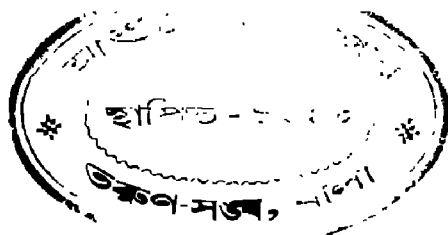
আট

বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া

১৮৬০ সালের মধ্যে বিদ্রোহের সম্পূর্ণ অবসান ঘটলো। কিন্তু তার ক্ষত-চিহ্ন রইল বর্তমান অনেকদিন পর্যন্ত। বিদ্রোহ ভারতের জীবনেতিহাসের ছন্দ দিল বদলে।

বিদ্রোহের ফলে ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বিচ্ছেদ হোল গভীর, ব্যবধান হোল বিস্তৃততর। দুই জাতির মধ্যে পরস্পর মেলামেশা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানে যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হতে পারতো, তার পথ রুদ্ধ হোল। সহৃদয়তার বদলে সৃষ্টি হলো বিক্ষুব্ধ নির্লিপ্ততার। ইংরেজ সৈন্যেরা ভারতীয়দের ঘৃণা করতে সুরু করলো—এমন কি যে-সব ভারতীয় তাদের হয়ে লড়েছে, তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে তাদের প্রতিও ইংরেজের অবজ্ঞার শেষ নেই। মানুষের আত্মা এক, মানবতা এক সে কথা তারা ভুলে গেল, উপহাস করে বলল, "ভারতীয়দের আবার আত্মা আছে না কি? যদি থাকে তবে নিশ্চয়ই সেটা আমাদের মতো উঁচুস্তরের নয়।" ঘৃণা বস্তুটা নেশার মতো, একবার সুরু হলে সহজেই তা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ডব্লিউ, এচ, রাসেল লিখেছিলেন, বিদ্রোহের ফলে দুই জাতির মধ্যে বিভেদ এত তীব্র হয়েছে যে, কোনোদিন আর পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ফিরে আসবেনা। বিদ্রোহের পরবর্তী পঞ্চাশ বছর

ধরে নীলকর, রাড, ফুলার ও ইলবার্ট বিল সম্পর্কে যে নিন্দনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে ইংরেজ, তাতে রাসেলের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। যদিও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূর হলো, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার কারণ রয়ে গেল, রয়ে গেল অবিশ্বাস ও অসন্তোষ।

বিদ্রোহের ব্যর্থতা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেও ভেদের সৃষ্টি করলো। মুসলমানেরা বিদ্রোহে বেশী উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখিয়েছে। এমন কি দাক্ষিণাত্যে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই সামান্য সেখানেও ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে মুসলমানেরা অনেক গুপ্ত ষড়যন্ত্র করেছে। সেগুলি ধরা পড়েছে। বিদ্রোহের সময় যেসব ব্রিটিশ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে তাদের ডাইরী ও চিঠিপত্রে প্রায়ই লেখা দেখা গেছে—"এ গ্রামটায় মুসলমান নেই, কাজেই এখানে আসতে সাহস করেছি।" কেউবা লিখেছে, "হিন্দুরা ফিরিঙ্গীদের প্রতি দয়া দেখিয়েছে, মুসলমানেরা তাদের সাবাড় করতে ব্যস্ত!"

বিদ্রোহ যখন সুরু হয়েছিল, হিন্দু মুসলমান সবাই তাতে অংশ গ্রহণ করেছে। বিদ্রোহ শুধু এক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিলনা। কিন্তু মুসলমানেরা কিছুটা ঐতিহাসিক কারণে, কিছুটা আদর্শের প্রয়োজনে বেশী পরিমাণে ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে শাহ অলিউল্লার মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনকে মনে করতো দার-উল্-হারব। তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকে তারা শুধু জাতীয়তার দিক দিয়েই

প্রয়োজনীয় মনে করেনি, বিদেশী শাসনের অবসান প্রচেষ্টাকে তারা তাদের ধর্মের অঙ্গ বলে জ্ঞান করেছে। কাজেই ব্রিটিশ সহজেই উত্তেজনাপ্রবণ মুসলমানের ভয়ঙ্কর ক্রোধকে যতটা ভয় করেছে, স্বভাবতঃ মৃদু প্রবৃত্তির হিন্দুকে ততটা নয়।

বিদ্রোহের পরে দমননীতির তীব্রতাও মুসলমানকেই ভোগ করতে হয়েছে বেশী। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি—যেমন ঝাজার, বল্লভগড়, ফারুকনগর, ফরাক্কাবাদের নবাবদের ফাঁসি বা নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে। স্যার উইলিয়ম মূর তাঁর ইণ্ডিয়ান মিউটিনি বইতে লিখেছেন, "কাল (১৮ই নভেম্বর ১৮৫৭) দিল্লীতে চব্বিশ জন শাহজাদাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জন সম্রাটের শ্যালক, দু'জন জামাতা, বাকী আর সব ভ্রাতুষ্পুত্র। মুসলমানদের এলাকাই দমননীতির প্রধান লক্ষ্য হয়েছে।" মেজর রেনোকে সেনাপতি নীল্ আদেশ দিলেন, "ফতেপুর সহরে বিদ্রোহ হয়েছিল। সেখানে উচিত শিক্ষা দেওয়া চাই। সহরের পাঠান বস্তি আক্রমণ করে অধিবাসীদের হত্যা করা চাই।" মুসলমানদের ধন সম্পত্তিও বেপরোয়া ভাবে বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ব্রিটিশ দিল্লী পুনরধিকার করার অল্পকাল পরেই হিন্দুদের নগরে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হলো, কিন্তু মুসলমানদের অনেকদিন ফিরতে দেওয়া হয়নি, তাদের ঘরবাড়ীর উপর যে পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল ১৮৫৯ সালের আগে তাও তুলে নেওয়া হয়নি। দিল্লীর আশে পাশে জেলার মুসলমানদের ভূসম্পত্তির প্রায় চার ভাগের

একভাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সে তুলনায় হিন্দুদের যে জরিমানা দিতে হয় তার পরিমাণ সামান্য।

ইংরেজের রাগটা বেশীর ভাগ পড়ল মুসলমানদের উপরে। পরবর্তীকালে যিনি ফিল্ডমার্শাল লর্ড রবার্টস হয়েছিলেন সেই ক্যাপ্টেন রবার্টস লিখেছিলেন, "বজ্জাত মুসলমানদের আচ্ছা করে দেখিয়ে দাও যে ভগবানের কৃপায় ইংরেজই এদেশের হর্তা কর্তা বিধাতা।" দোষী নির্দ্দোষীর কোন বাছবিচার ছিল না। সৈয়দ আহাম্মদের মতো নির্জলা ব্রিটিশ ভক্তের পরিবারও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পায়নি। (জি. এফ. আই, গ্রেহাম লিখিত 'সৈয়দ আহাম্মদ খান', পৃঃ ২৭-২৮)। কবি গালিবের একটি লেখাতে এই ভয়াবহ সন্ত্রস্ত আবহাওয়ার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়ঃ

"শহর হো গৈ সাহারা। শহর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। উর্দু বাজার গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে, উর্দু ভাষা আর বলবে কে? দিল্লী আর সেই মহানগরী নেই, তার দুর্গ, তার শহর, তার দোকানপাট, তার ফোয়ারা সব কিছুই গেছে। হিন্দু মহাজনেরা আছে, কিন্তু ধনী মুসলমান আর নেই বললেই হয়। চেনা-জানাদের মধ্যে এত লোককে হত্যা করা হয়েছে যে আজ যদি আমার মৃত্যু ঘটে, শোকে চোখের জল ফেলবে এমন কেউ আর বড় নেই।"

সে-সময় দিল্লীতে সবার মনেই যে বিপদ ও অনিশ্চয়তার ভয় বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ মিলবে নিম্নোদ্ধৃত লেখাটিতেঃ

"দিল্লীর কোতল্‌-এ-আম-এ (দিল্লী পুনরুদ্ধারের পরে ব্রিটিশ যে পাইকারী হত্যাকাণ্ড সুরু করেছিল তারই নাম কোতল্‌-এ-আম) হাকিম রেজাউদ্দিনকে গুলী করে হত্যা করা হলো। আহাম্মদ হোসেন ও তাঁর ছোট ভাইকেও হত্যা করা হলো ঐ দিনই। তালিয়ার খানের দুই ছেলে তঙ্ক থেকে এসেছিল দিল্লীতে বেড়াতে। বিদ্রোহ ঘটাতে তারা আর ফিরে যেতে পারেনি। তাদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে আজ।" (গালিব রচিত উদ-ই-হিন্দ)

মুসলমানেরা শুধু যে বিদ্রোহের মধ্যেই বেশী অংশ গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে ব্রিটিশের হাতে বেশী নির্যাতন সহ্য করেছে তাই নয়, তারা অনেকদিন পর্যন্ত ব্রিটিশের প্রতি বিরুদ্ধতা বজায় রেখেছে, নানাভাবে তারা এই ব্রিটিশ বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছে, নানা স্থানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। সিতানা ও পাটনায় এই ষড়যন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি ছিল। মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণেরও বিরোধিতা করেছে। তার ফলে ক্রমশঃ তারা ইংরেজের অধীনে সরকারী চাকুরী ও অর্থকরী বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। হিন্দুরা ধীরে ধীরে পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারাকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু মুসলমানেরা নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রাচীন বিশ্বাসকে আঁকড়ে রয়েছে দীর্ঘকাল। দিল্লীতে মুসলিম শাসনকালে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, বিদ্রোহের ফলে তা একেবারে মুছে গেল। ১৮৫৮ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার জানুয়ারী—জুন সংখ্যায়

জনৈক প্রবন্ধ লেখক লিখেছেন—"পাঁচ বছর আগে আমি দিল্লীতে গিয়েছিলাম। সেখানে মুস্লিম পত্রিকার সংখ্যাধিক্য দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।" বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ যখন দিল্লী বিধ্বস্ত করল তখন আর তার কিছুই অবশিষ্ট রইলনা। সংস্কৃতির কুসুম শুকিয়ে ধূলায় ঝরে পড়ল। 'জাকাউল্লা অব দিল্লী' গ্রন্থে সি, এফ এণ্ড্রুজ লিখেছেন, "বিদ্রোহের এক বছর পর পর্যন্ত দিল্লীর উপর দিয়ে যে মরণ-ঝঞ্ঝার তাণ্ডব গেছে তাতে সংস্কৃতির আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রইলনা। সে আঘাতের জের মুস্লিম শিক্ষা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।"

অন্যদিকে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুত্থানের পীঠ ছিল কলকাতা। সেখানে বিদ্রোহের ঝড় বয়নি, তার রুধিরাক্ত বন্যার প্লাবন থেকে সে রক্ষা পেয়েছে, তার ধনসম্পত্তি জনপ্রাণী রয়েছে অক্ষত, তার সংস্কৃতি রয়েছে অনাহত।

এর ফলেই হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। ব্যবধান অপ্রীতির, সন্দেহের, এবং তিক্ততার। আজ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন যে সাম্প্রদায়িক কলহের দ্বারা কণ্টকিত তা সিপাহীবিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তীকালের উত্তরাধিকার।

বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান ঘটলো। অদৃষ্টের পরিহাস, ঠিক একই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গভূমি থেকে তৈমুরলঙের বংশধরগণও অদৃশ্য হলেন চিরতরে। ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতবর্ষের

শাসনভার গ্রহণ করলেন। তাঁদের প্রথম চিন্তা হলো এমন ব্যবস্থা করা যাতে ভবিষ্যতে বিদ্রোহের আর পুনরাবির্ভাব না ঘটে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভারতীয় ভিত্তি দৃঢ়তর করার দিকে তাঁরা মনোযোগ দিলেন।

১৮৭৯ সালে আর্মি কমিশন মন্তব্য করলেন,—"সিপাহী বিদ্রোহ এই শিক্ষা রেখে গেছে যে ভারতবর্ষে একদল দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ সৈন্য রাখা প্রয়োজন এবং সেনাবিভাগের গোলন্দাজ অংশটা—ইংরেজীতে যাকে বলে আর্টিলারী—পূরোপুরি ইউরোপীয় সৈন্যদের হাতে রাখতে হবে।" সেনাবিভাগের পুনর্গঠন সম্পর্কে পীল কমিশন (১৮৫৮) সুপারিশ করলেন,— সেনাবিভাগে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সৈন্যের অংশ ৫ : ১ থেকে ২ : ১ এ নিয়ে আসতে হবে বাংলায় এবং ৩ : ১ বোম্বাই ও মাদ্রাজে। দেশীয় বাহিনী কমিয়ে অর্ধেক করা হলো। মোট ৭৭টি সেনাদল বাতিল করে দেওয়া হলো এবং বাকী দলগুলিকেও সংখ্যা কমিয়ে ঢালা ৬০০ সিপাহীতে দাঁড় করানো হলো। মিলিটারী পুলিশ নিয়ে প্রায় ২০০,০০০ লোক কমিয়ে দেওয়া হলো।

একজন ইউরোপীয় সৈন্য পুষতে খরচ লাগে পাঁচজন দেশীয় সৈন্যের সমান। তাই সেনাবিভাগের এই পুনর্গঠনের ফলে ভারতের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি হলো সাঙ্ঘাতিক রকমে। তা ছাড়া ইউরোপীয় সৈন্যদলকে একটি স্থানীয় বাহিনী হিসাবে রাখা হলোনা। ১৮৫৯ সালে বড়লাট লর্ড ক্যানিং লিখলেন, "আমার এই দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, ইউরোপীয় সৈন্যদলকে

স্থানীয় বাহিনীরূপে রাখাটা খুব ভুল হবে। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে ইউরোপীয় বাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও রাজানুগত্যের ভাব বজায় রাখা। সেজন্য মাঝে মাঝে বাহিনীর সমস্ত বিভাগের লোকদেরই স্বদেশ ফিরতে দেওয়া দরকার।” এই কথাগুলির আসল অর্থ হলো এই যে,—কোনো ইউরোপীয় সেনানী যেন এদেশের জলহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে না ওঠে, এদেশের প্রতি, তার জনসাধারণের প্রতি তারা যেন সহানুভূতিশীল না হয়, বারে বারে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে মনের মধ্যে এ-ভাবটা যেন তারা জিইয়ে রাখতে পারে যে তারা ভারতবর্ষে একটা দখলদারী বাহিনী—অকুপেশ্যান আর্মির অঙ্গ। ১৮৬১ সালের ‘আর্মি এমালগামেশন স্কিম’ অনুসারে লর্ড ক্যানিংএর এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হলো। তার ফলে ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপলো সামরিক ব্যয়ের জগদ্দল পাথর ; ইউরোপীয় বাহিনী পোষণের বৃহৎ ছিদ্র দিয়ে তার দরিদ্র জনগণের অর্থ গেল তলিয়ে।

সামরিক ঘাটি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি,—বড় বড় তোষাখানা, অস্ত্রাগার, দুর্গ প্রভৃতি দেশীয় সৈন্যদের কাছ থেকে নিয়ে দেওয়া হলো ইউরোপীয় বাহিনীর হাতে। ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা করা হলো দ্বিগুণ। স্যার রিচার্ড টেম্পল বললেন, “সাম্রাজ্যের সর্বত্রই এখন এত ইউরোপীয় সৈন্য আছে যে দেশে কোনোদিন বিদ্রোহ ঘটলে তাঁরা অনায়াসে তা দমন করে সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারবে।” একমাত্র নর্থ ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার ব্যাটারী ছাড়া, আর্টিলারীর সমস্তটাই দেশীয় সৈন্যদের কাছ থেকে সরিয়ে

নেওয়া হলো। ব্রিটিশ সেনা বিভাগের একটি অংশ হিসাবে ভারতের আর্টিলারী নূতন ভাবে পুনর্গঠিত হলো।

নূতন সৈন্যদলের দেশীয় অংশে উচ্চবর্ণের লোকদের সযত্নে পরিহার করা হলো। সামরিক ও সামাজিক কর্তৃত্বের যে সংমিশ্রণ ছিল পুরাতন ব্রাহ্মণ 'সেনাবাহিনীতে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। দেশীয় সেনাবাহিনীতে কেবল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই স্থান পেলো, আর পেলো গুর্খা, শিখ ও সীমান্তের পাঠান। বেঙ্গল আর্মিতে নেওয়া হলো ৮২,০০০ পাঞ্জাবী, সেটা প্রকৃত পক্ষে হয়ে দাঁড়াল পাঞ্জাব আর্মি। নূতন দেশীয় সৈন্যদল গঠিত হলো ভেদ ও পরস্পরের প্রতিষেধক নীতির উপর ভিত্তি করে। ১৮৫৮ সালে সার জন লরেন্স, নেভিল চেম্বারলেন ও হার্বার্ট এডওয়ার্ডস দেশীয় বাহিনীকে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য রাখার একটা প্রস্তাব করলেন। তাঁরা বললেন, "দেশীয় দলের পাশেই একটা ইউরোপীয় দল রাখা ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের প্রতিষেধক সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশীয় বাহিনীর মধ্যেও একদলের প্রতিষেধক হিসাবে আর একদল গড়ে তুলতে পারলে নিরপত্তা আরও বাড়বে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তা করবার উপায় হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন জাত ও শ্রেণী থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের এক দলে ভর্তি করা। থিওরি হিসাবে এটা ভালো মনে হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে এতে বিশেষ ফল লাভ হয় না। দেখা গেছে যে বিভিন্ন জাতের লোক কিছু একত্র থাকলে ক্রমশঃ তাদের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী,

মনোভাব ও সংস্কার প্রভৃতি দূর হয়, ক্রমশঃ তারা পরস্পর প্রভাবান্বিত হয়ে এক হয়ে যায়। যে-উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন জাত ও শ্রেণী থেকে তাদের সংগ্রহ করা হয় সে উদ্দেশ্যই শেষে ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন সেনাবিভাগে জাতের বা অংশের পার্থক্য রাখা প্রয়োজন। সেটা রাখতে হলে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে এক অঞ্চলের মুসলমানই অন্য অঞ্চলের মুসলমানকে ঘৃণা করতে পারে। তা করতে হলে সিপাহীদের প্রদেশ গত ভাবে সংগঠন করা দরকার।" ভৌগলিক অবস্থিতির ফলে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কতগুলি আচার ব্যবহার ও মনো-বৃত্তির উদ্ভব ঘটে যার ফলে তীব্র ভেদনীতির সৃষ্টি সম্ভব। এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের লোকের প্রতি যার ফলে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করবে। এই কারণে প্রাদেশিক ভিত্তিতে সৈন্যদল গঠিত হোলে তাদের মধ্যে কোনোকালেই ঐক্য বোধ জন্মাতে পারবে না,—এই ছিল ইংরেজ ধুরন্ধরদের বিশ্বাস। পীল কমিটি সে প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দল গঠনের নীতি দ্বারাই অতঃপর ভারতীয় বাহিনী গঠিত হলো। ভারতীয় জনগণের হয়ে ভারতীয় সৈন্যেরা অস্ত্র ধরবে এ সম্ভাবনা আর রইল না। জনৈক বিদ্রোহী খেদ করে বলল, "হায়রে, সিপাহীদের সাহায্যে দেশের জনগণকে দমন করেছ বিদ্রোহের সময়ে, এখন সিপাহী দিয়ে সিপাহীর দমন করবে। ধন্য তুমি ইংরেজ, তোমার বিরুদ্ধে লড়বে দেশে আর এমন কেউ রইল না।"

কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে নিরাপদ করতে একমাত্র সেনাবিভাগের পুনর্গঠনই যথেষ্ট নয়। দেশীয় ভিত্তিটাও সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করা চাই। ১৮৫৮ সালের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার বাক্যবিন্যাস ছেঁটে কেটে আসল কথাটা দাঁড়ায় এই যে, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে শক্তিশালী করাই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, তাতেই আছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিরাপত্তা।

স্যার জন ষ্ট্র্যাচী তাঁর 'ইণ্ডিয়া' পুস্তকের ২৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বিদ্রোহের পরে ইংলণ্ডে ও ভারতে ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের প্রসার ঘটেছে দ্রুত বেগে।" দেশীয় রাজন্যবর্গ বিদ্রোহ দমনে প্রভূত সাহায্য করেছেন। ক্যানিং তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখলেন, "দেশীয় রাজন্যবর্গ যদি বিদ্রোহের বন্যায় যোগ দিত তবে ভারতে ইংরেজ শাসনকে খড়-কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। দেশীয় রাজন্যদের জিইয়ে রাখা ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব রক্ষার প্রথম উপকরণ (পি, ই, রবার্টস লিখিত "ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৩৮৮)। শুধু দেশীয় রাজারা নয়, জমিদারও ইংরেজের পক্ষপুটে আশ্রয় লাভ করলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বিলাতে ভারত সচিবকে লিখলেন (১৮৫৯), "এ দেশে ভূম্যধিকারীর দল সৃষ্টি করার গুরুত্ব এত বেশী যে, তার জন্য আমাদের যদি আর্থিক কিছু ক্ষতিও ঘটে, তাও স্বীকার করা প্রয়োজন।" এই নীতির অনুসরণে একদা লর্ড ক্যানিং যাদের "অত্যন্ত সাধারণ লোক—

না আছে বংশ গৌরব, না আছে বিচক্ষণতা, না আছে জমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ"—বলে অবজ্ঞা করেছিলেন সেই তালুকদার-দেরই অযোধ্যায় জমিদারীর বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। এমনকি এদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণও করেছিল। তা সত্ত্বেও এদের ১৮৫৬ অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক সর্তে জমিদারী দেওয়া হলো।

গোটা ভারতবর্ষেই জমিদারী প্রথার প্রবর্তন করা যায় কিনা সে সম্পর্কেও অনেক বিচার বিবেচনা করা হয়েছিল এবং একমাত্র গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অনটনের কারণেই শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়নি। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে এ নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে (এইচ, এস, কানিংহ্যাম লিখিত, "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটস্ রুলার্স," পৃঃ ১৬২)। জমিদারদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে হবে গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের ক্ষতি না ঘটিয়ে কৃষকদের ক্ষতি করে! সম্বলপুর ও মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য বিদ্রোহ বিধ্বস্ত অঞ্চলে এই সময়ে মালগুজারী প্রথার প্রবর্তন করা হলো। পাঞ্জাবের একটি জেলাতেই ৪৬,০০০ কায়েমী রায়তের মধ্যে বারো আনা লোককে কলমের এক আঁচড়ে বাস্তু রায়তে পরিণত করা হলো, যাদের যে-কোন সময়ে জমিদারের ইচ্ছামতো উচ্ছেদ করা যেতে পারে। এই সঙ্গে তালুকদারদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী কর্তৃত্ব দেওয়া হলো। পারিবারিক ভিত্তিতে সামন্ততন্ত্রকে এই ভাবে কায়েম করা হলো ভারতবর্ষে।

একদা যে সামন্ততন্ত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল সেই সামন্ততন্ত্রই সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বীকৃত হলো সগৌরবে। সামাজিক বিবর্তনে এ-রকম আপাতঃ বিরোধী ব্যবস্থা ঘটে থাকে হামেসাই।

শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎসাহ ও প্রশ্রয় দেওয়ার নীতি অনুসরণ করেই ব্রিটিশ ক্ষান্ত হয়নি, সমাজ ব্যবস্থায়ও সনাতনী মতবাদকে বাঁচিয়ে রাখার দিকে লক্ষ্য আছে ইংরেজের। লর্ড ডালহৌসী দেশীয় প্রাচীন ও অন্ধ সংস্কারকে দেশ থেকে দূর করে নতুন সভ্যতার প্রবর্তনে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের পরে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা হলো পুরাতন মনোভাবকেই প্রশ্রয় দেওয়া। নারীশিক্ষা, বহু বিবাহ নিবারণ প্রভৃতি প্রগতিমূলক সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে গভর্ণমেণ্ট আর উৎসাহ দেখালেন না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন (১৮৬৯) পাশ করাতে পারলেন না, যদিও দেশের অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিই তাঁর পক্ষে ছিলেন। স্যার হেনরী মেইন লিখেছেন, "১৮৫৭ সালের ভয়াবহ বিদ্রোহের পরে ভারতীয় শাসনকর্তাদের মনে দেশীয় ব্যক্তিদের সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপের সম্পর্কে একটা ভয় ঢুকেছে।"

বিদ্রোহের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামান্য হয়নি। ডক্টর বুকানন অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক দিয়ে সিপাহীবিদ্রোহকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও ওপিয়াম ওয়ারের সঙ্গে যে তুলনা

করেছিলেন সেটা মিথ্যা নয়। বিদ্রোহ ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজত্ব বিস্তার নীতির সমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ ও প্রভুত্ব পাকা করার দ্বার উন্মুক্ত করেছে, বাণিজ্য বিস্তারের সহায়তা করেছে। স্যার জন সিলী তাঁর "এক্সপানসন্ অব ইংল্যাণ্ড" বইতে লিখেছেন (পৃঃ ৩১০), বিদ্রোহের পরে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভৌগলিক সীমা বর্ধিত হয়নি। অথচ আশ্চর্য এই যে তার পরের বছর পঁচিশের মধ্যেই অতিদ্রুত বাণিজ্য বিস্তার ঘটেছে। বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৩৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে ঐ সময়ের মধ্যে।

এই সব পরিবর্তন ভবিষ্যতে একদিন এমন এক শক্তির সৃষ্টি করবে, যা হয়তো সাম্রাজ্যের ভিৎ নাড়া দেবে,—এ আশঙ্কা ইংরেজের মনে ছিল। বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ভারতবর্ষের মৃত্যু ঘটলো। নূতন যে-ভারতবর্ষ একদিন পশ্চিমের নব-ভাবধারাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে তাই হবে ইংরেজ শাসনের প্রতিপক্ষ। ভারতবর্ষের সেই নবজন্মকে ঠেকিয়ে রাখার উপরই নির্ভর করে ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের স্থায়িত্ব। তাই প্রগতিমূলক আইন ও আন্দোলনকে গভর্ণমেণ্ট প্রীতির চোখে দেখলেন না, কায়েমী স্বার্থ ও প্রগতিবিরোধী শক্তিকে তাঁরা প্রশ্রয় দিলেন। বিদ্রোহের ফলে ভারতে গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটলো।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে গণ্য করা ভুল। সমাজের বহু অসন্তোষ, আক্রোশ, তিক্ততা একত্রীভূত

হয়ে যে বিরাট আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করেছিল, বিদ্রোহ তারই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে দেশের আবহাওয়ার অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বিদ্রোহের ক্ষতচিহ্ন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে আজো রয়েছে গভীর, রয়েছে সুস্পষ্ট।
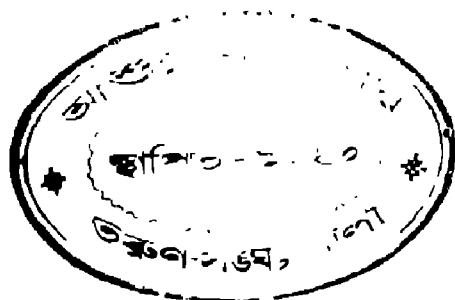
কালানুক্রমিক ঘটনা নির্ঘণ্ট

১০ই মে, ১৮৫৭	মীরাটে বিদ্রোহের সুরু।
১২ই মে, ১৮৫৭	দিল্লীর অবরোধ
১২ই মে—২৪শে সেপ্টেম্বর	স্বাধীনতা রক্ষার্থে দিল্লীর সংগ্রাম
২৩শে মে	কাশী ও এলাহাবাদে বিদ্রোহ।
৪ঠা জুন	লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহ।
৫ জুন ১৮৫৭ থেকে ২১ মার্চ ১৮৫৮	লক্ষ্ণৌর যুদ্ধ।
৫ই জুন ১৮৫৭	কানপুরে বিদ্রোহ।
৬ই জুন—২৬শে জুন	কানপুরের অবরোধ।
২৭শে জুন	জেনারেল হুইলারের আত্মসমর্পণ।
২৯শে জুন	চিন্‌হাটে ব্রিটিশের পরাজয়।
২৯শে জুলাই—১৬ই আগষ্ট	লক্ষ্ণৌ থেকে হ্যাভলককে হটিয়ে দেওয়া হয়।
১৪ই থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর	দিল্লীর পতন।
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৫৭ থেকে ৩রা জানুয়ারী ১৮৫৮	ব্রিটিশ কর্তৃক ডোয়াব পুনর্দখল
২১শে ডিসেম্বর ১৮৫৭ থেকে ৪ঠা মার্চ ১৮৫৮	অযোধ্যা পুনর্দখল।
৩রা মার্চ ১৮৫৮	বুন্দেলখণ্ড পুনর্দখল।
৮ই থেকে ২০শে মার্চ	লক্ষ্ণৌর পতন।
৩রা এপ্রিল	ঝাঁসীর পতন।
৬ই মে	বেরিলীর পতন।

২৩শে মে	কল্লিতে বিদ্রোহীদের পরাজয়।
২রা জুন	গোয়ালিয়র দখল।
১৮ই জুন	রাণী লক্ষ্মীবাঈর মৃত্যু।
২০শে জুন	গোয়ালিয়রের পতন।
২রা আগষ্ট	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান।
১লা নভেম্বর	মহারাণীর ঘোষণা।
১লা থেকে ৩০শে নভেম্বর	অযোধ্যার খণ্ড যুদ্ধ।
৭ই এপ্রিল	বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁতিয়া টোপী ধরা পড়ল।
১৮ই এপ্রিল	তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি।
অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর	বিদ্রোহীদের নির্মূলকরণ।
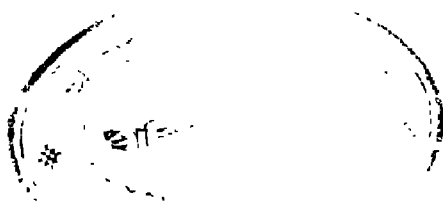
গ্রন্থপঞ্জী

এই পুস্তক রচনায় লেখক যে-বিভিন্ন পুস্তকের সহায়তা নিয়েছেন, যথাস্থানে তার নাম, পত্রাঙ্ক ও গ্রন্থকারের উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র স্বর্গগত রজনীকান্ত গুপ্ত লিখিত "সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস" ছাড়া বাংলায় এ সম্পর্কে দ্বিতীয় কোন উল্লেখযোগ্য বই নেই। যে সকল ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ণতর বিবরণ জানতে আগ্রহশীল তাঁদের জন্য নিম্নে আমরা একটি তালিকা দিলেম:

i. BACKGROUND BOOKS

1. Edward Thompson and G. T. Garrat :
Rise and Fulfilment of British Rule in India
2. L. S. S. O'Malley :
Modern India and the West

ii. GENERAL HISTORY OF THE MUTINY

1. J. W. Kaye and G. B. Malleson :
History of the Sepoy War in India, 6 volumes
2. T. Rice holmes :
History of the Indian Mutiny
3. G. W. Forrest :
History of the Indian Mutiny, 3 volumes
4. Charles Ball :
History of the Indian Mutiny, 2 volumes
5. V. D. Savarkar :
Indian War of Independence, 2 volumes
6. Edward Thompson :
The Other Side of the Medal

iii. REGIONAL ACCOUNTS

1. J. Bonham : *Oudh in 1857*
2. G. O. Trevelyan : *Cawnpore*
3. Jacob : *Western India before and during the Mutiny*
4. J. Cave-Brown : *The Punjab and Delhi in 1857*
5. C. Raikes : *Notes on the Revolt in the N.-W. P.*

iv. BIOGRAPHIES AND MEMOIRS

1. Owen Tudor Burns : *Clyde and Strathnaira*
2. W. W. Hunter : *Dalhousie*

3. H. S. Cunningham : *Canning*
4. Auckland Colvin : *John Russel Colvin*
5. Aitchison : *Lord Lawrence*
6. Trotter : *Life of John Nicholson*
7. J. Macleod Innes : *Sir Henry Lawrence*
8. C. Campbell : *Memoirs of my Indian Career*, 2 volumes
9. Parasnis : *Rani of Jhansi*

v. DOCUMENTS

1. Forrest, G. W. : *Selections from the letters, despatches and other state papers in the Military Department of the Government of India, 1857-58*, 4 volumes
2. William Muir : *Records of the Intelligence Department of the N.-W. P. during the Mutiny*, 2 volumes
3. Punjab Government Records : *Mutiny Correspondence and Reports*, 4 volumes

vi. CONTEMPORARY PUBLICATIONS

1. Alexander Duff : *The Indian Rebellion*
2. Syed Ahmed Khan : *Asbab-e-Bagawat* (English translation by Graham and Colvin)
3. Ghalib : *Ood-i-Hindi* (A collection of Ghalib's letters that convey the atmosphere of the period)
4. Malleson : *Red Pamphlet*
5. Metcalfe, C. T. : *Two Native Narratives*
6. W. H. Russell : *My Diary in India*, 2 volumes